College Form No 4

This book was taken from the Library on the date last stamped. It is returnable within 14 days

বাংলাগল্প বিচিত্রা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.
Agartala.

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকব—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা-১২

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

আচার্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রাচীন, প্রবীণ এবং আধুনিক সাতজন কথা-সাহিত্যিকের উপর ভিত্তি করে বাংলা ছোটগল্পের রূপ-বৈচিত্র্য বইখানিতে দেখাবার চেষ্টা করেছি। মাত্র এই সাতজনই যে বাঙালি গল্প-লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করেন আমার বক্তব্য কখনোই তা নয়। আমি সাতজনকে নিয়ে আলোচনা করেছি, এইটুকুই আমার কৈফিয়ত।

যার সস্নেহ-প্রেরণায় এ-কাজে হাত দিয়েছিলাম, বইখানি তাকেই নিবেদন করে আমি ধন্য হয়েছি।

কলিকাতা
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

১। প্রথম প্রসঙ্গ
[ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়] ... ১

২। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ
[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়] ... ১৮

৩। তৃতীয় প্রসঙ্গ
[পরশুরাম] ... ৪৮

৪। চতুর্থ প্রসঙ্গ
[প্রেমেন্দ্র মিত্র] ... ৭০

৫। পঞ্চম প্রসঙ্গ
[তারাশঙ্কর] ... ১০৬

৬। ষষ্ঠ প্রসঙ্গ
[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] ... ১৩৮

৭। সপ্তম প্রসঙ্গ
[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়] ... ১৮১

বাংলাগল্প বিচিত্রা

বাংলাগল্প বিচিত্রা

প্রথম প্রসঙ্গ

রঙ্গ ও রূপক

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের স্রষ্টারূপে বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ অমরত্ব লাভ করেছেন। এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এর অনন্যতায়। বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় উপন্যাস এর আগে আর রচিত হয়নি এর পরেও না। শিশুচিত্তরঞ্জনী রূপকথা-ধর্মী এই উপন্যাসটি রূপকের ব্যঞ্জনায়, সমাজ ও জীবন-সমালোচনার তীক্ষ্ণ মনস্বিতায় এবং সরল ও সরস ভাষার রস-সেচনে অপূর্বতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ বাঙালি পাঠক পর্যন্ত সকলেই সমানে এর রসাস্বাদন করেছেন। জীবনপ্রেমের উৎস থেকে নির্ঝরিত এই 'কঙ্কাবতী' বাংলা সাহিত্যে নির্দোষ ও নির্মল হিউমারের একটি স্ট্যাণ্ডার্ড গড়ে দিয়েছে।

'কঙ্কাবতী'র সমস্ত গুণপনা ত্রৈলোক্যনাথের ছোট গল্প-গুলিতেও প্রতিভাত। 'কঙ্কাবতী', 'ময়না কোথায়' অথবা 'পাপের পরিণাম' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে সর্বপ্রথমেই উপলব্ধি করা যায় যে ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলতে

জানেন। সে গল্প বঙ্কিমের রীতিতে নয়। বহির্মুখী রোমান্সের তন্ময়তার অধ্যায় পার হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশ অন্তর্মুখীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার চরিত্রগুলিতে মন্ময় গভীরতা সঞ্চারিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহের' কামানগর্জন জেব-উন্নিসার মর্মযন্ত্রণার কলধ্বনির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে—'সীতারাম' উপন্যাসের ঘাত-সংঘাতের চরম পরিণাম অর্জিত হয়েছে সীতারামেরই মানসলোকে। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তো বলাই বাহুল্য। ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসে গল্পে মনোজগতের কোনো নতুন আবিষ্করণ নেই চেতন-অবচেতনের আলো অন্ধকারে মানব-চিত্তের বিচিত্র রহস্যময়তার কোনো সংকেতও তারা বহন করে আনে না। সেদিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে কিছু প্রত্যাশা করলে পাঠকমাত্রেই নিরাশ হবেন। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের স্থান অন্তরের অন্দরমহলে নয়, তা বৈঠকখানাসুলভ শ্রুতি-রঞ্জনতাতেই পূর্ণ পরিণাম লাভ করেছে

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে আমরা বাঙালীর দুটি যুগকে দেখতে পাই। প্রাচীন বাঙালির রূপকথাপ্রীতি, উৎকট কল্পনা এবং রসগল্পের সংস্কার ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যেও অব্যাহত আছে। বটতলার 'ঠাকুর মশায়ের গল্প'-জাতীয় রঙ্গ ও রসিকতার সবল সরসতা ত্রৈলোক্যনাথ নিষ্ঠাভরেই অনুবর্তন করেছেন। তাঁর 'পাপের পরিণাম' বা 'ফোক্‌লা দিগম্বর' এর অতিরিক্ত কিছু নয়—'মজার গল্প' কিংবা 'মুক্তামালা'র গল্পগুলিতেও আমরা সেই

ঐতিহ্যের অনুসরণই দেখতে পাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বভাবতই ত্রৈলোক্যনাথ বর্ণ- ও -বৈচিত্র্যবিহীন। তাঁর আসল কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে, 'ভূত ও মানুষে'র বিচিত্র আখ্যানে এবং 'ডমরু চরিতের' অনবদ্য গল্পমালায়। রূপকথা এদের মধ্যে 'রূপক' হয়ে দেখা দিয়েছে, চরিত্রগুলি এক-একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে এবং আপাতকৌতুক সামসময়িক কালের কঠিন ব্যক্তি ও- -জীবন-সমালোচনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। এইগুলির ভেতরেই ত্রৈলোক্যনাথের আসল বৈশিষ্ট্য এইখানেই শিল্পী হিসেবে তার অসাধারণত্ব।

সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ বহির্মুখ। তাঁর রচনা ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র-বৈচিত্র্যের ওপরেই নির্ভরশীল। এই বাহিরচারী মনোভঙ্গির একটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে।

কারণটি আর কিছু নয়, তা হল তাঁর ব্যক্তিজীবনের অসাধারণ অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই ত্রৈলোক্য-নাথের মন বাইরের পৃথিবী-সম্বন্ধে দুঃসাহসিক কৌতূহলে এবং অ্যাডভেঞ্চার-প্রবণতায় উদ্দীপ্ত। চা-বাগানের আড়কাঠির হাতে পড়া থেকে আরম্ভ করে কোনো কীর্তিই তাঁর আর বাকী থাকে নি। ত্রৈলোক্যনাথের নিজের ভাষাতেই তাঁর বাল্য অভিজ্ঞতা কিছুটা শ্রবণ করা যাক :

"২।৪ দিনের মধ্যে বালকদের মধ্যে আমি কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলাম। সকলকে অসমসাহসিক কার্যে নিযুক্ত করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া,

তাড়াতাড়ি করিয়া, মা'র কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কাঁসাই নদীর মূল নির্দেশ কবিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিলাম।" *

পলাতক জীবনের আর একটি অভিজ্ঞতা এই রকম :

"অল্পদিন পরেই রাঁচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ অনুসরণ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দু জন ঢাকাই মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্যপ্রদেশে তাহারা হাতী ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছুদিন পরে জঙ্গলের মাঝে একদিন তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল। পুনরায় রাঁচি আসিলাম।"* *

ছেলেবেলা থেকেই যে চঞ্চলতা ও দুঃসাহস ত্রৈলোক্যনাথের চরিত্রে দেখা যায়—পরিণত বয়সেও তা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। উড়িষ্যায় পুলিসের সাব্-ইনস্পেক্টর থাকবার সময় সেখান থেকে ওড়িয়া ভাষা তুলে দিয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের উৎকট আদর্শও তাঁর মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল, একটি ভাষার সূত্রে তিনি সারা ভারতের মধ্যে একতা আনবেন। এই ঐক্যের প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষা তুলে

*বঙ্গভাষার লেখক

**বঙ্গভাষার লেখক

দিয়ে হিন্দী প্রচলনেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু উন্মাদ কল্পনা, দেশপ্রেম এবং দুরন্ত সাহসই উত্তরকালে তাঁকে অসামান্য সাফল্য এনে দিয়েছিল। ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে তিনি উন্নীত হন এবং পরিশেষে লণ্ডনের আন্তর্জাতিক এক্‌জিবিশনে ভারত সরকারের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে তিনি ইয়োরোপ-ভ্রমণের সৌভাগ্যও লাভ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথের এই বহুবিচিত্র জীবনই তাঁর সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কল্পনার উদ্দামতা, নানামুখী পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ, সংস্কারমুক্ত একটি বলিষ্ঠ সুহৃদয় এবং পরিশীলিত মার্জিত বুদ্ধি কৌতুকাশ্রয়ী হয়ে তাঁর সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যরেখা এঁকে দিয়েছে। তাঁর রচনায় তাই আত্মমুখী মনোমন্থন নেই - বহির্মুখী গতিবেগই তার লক্ষণীয় বিশেষত্ব। কিন্তু মাত্র এইটুকুই নয়। ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে, চেনা-অচেনায় পরিক্রমণ করতে করতে ত্রৈলোক্যনাথ দেশের মানুষের মর্মন্তুদ লজ্জা-লাঞ্ছনা-পরাজয় ও দারিদ্র্যের ছবি দেখেছিলেন। জাতি এবং মানুষের প্রতি করুণায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তিনি সংকল্প করেছিলেন যেমন করে হোক দেশের কল্যাণ করবেন, জাতির দুঃখমোচন করবেন। তাই তাঁর সাহিত্যে যাবতীয় বহির্গামী উদ্দাম কল্পনা এবং পরীক্ষা-প্রয়াসের অন্তরালে মানুষের জন্যে অকৃত্রিম সহানুভূতি, জীবনের প্রতি সীমাহীন মমতা ও সর্বাত্মক শুভবুদ্ধি অভিব্যক্ত। 'কঙ্কাবতী'র কৌতুককাহিনীর মর্মলোকে এই জাতীয়তাবোধের ফল্গুধারাই

বয়ে চলেছে। রূপকের ছদ্মবেশে তৎকালীন দেশীয় সাহেবদের উদ্দেশ্যে ত্রৈলোক্যনাথের সমালোচনা এই রকম :

'কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন্ দিকে? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে পৌঁছিব?"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন, –"হিট্ মিট্ ফ্যাট্।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,– –"ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভালো করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি কোন্ দিক দিয়া যাইলে গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়?"

ব্যাঙ বলিলেন, –"হিশ্ ফিশ্ ড্যাম্।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! আমি দেখিতেছি, —আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজী পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।"

ব্যাঙ এদিক ওদিক চাহিলেন। কারণ, লোকে যদি শুনে যে তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে 'নেটিভ' মনে করিবে। যখন দেখিলেন,— কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।···

···ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, —"মোলো যা! এ-হতভাগা ছুঁড়ীর রকম দেখ! কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ!

কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় নাকি? আমার নাম,—মিস্টার গমিশ।” ’ (কঙ্কাবতী)

এ যেমন জাতির চরিত্রসমালোচনার দিক, তেমনি জীবনপ্রীতির ও মমত্ববোধের নিদর্শনও তাঁর রচনার সর্বত্র মণিমুক্তোর মতো ছড়ানো আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ‘মুক্তামালা’র সূচনায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুরুদেবের পাঁঠার ব্যবসার যে কাহিনীটি আছে, তার সকরুণ বর্ণনা আমাদের শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্পটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিষ্ঠাবান্ গোলোক চক্রবর্তী, যিনি মাছ-মাংস খান না, সদ্‌ব্রাহ্মণরূপে সকলের কাছ থেকে যিনি শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে থাকেন—ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর যে পরিচয় এই প্রসঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছেন—তার বীভৎসতার তুলনা নেই :

“পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর, তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীবন্ত অবস্থাতেই মুণ্ড দিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা!…আমি বলিয়া উঠিলাম, —‘ঠাকুর মহাশয়! ঠাকুর মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন।

প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।'

ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, 'চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীবন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীরের ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে একপ্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়।······ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়া-মায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।' " (মুক্তামালা -সূচনা, দ্বিতীয় রজনী)

এক দিক থেকে এ বর্ণনাও রূপক। ব্রাহ্মণ-নির্দেশিত সমাজবিধি সমগ্র জাতির ওপর যুগ-যুগান্তর ধরে যে নিষ্ঠুর কশাইবৃত্তির আচরণ করে এসেছে—এ যেন তারই প্রতিচ্ছবি। এই সমাজের বিধানেই তিন বছর বয়সের বিধবা শিশুকে একাদশীর নিরম্বু উপবাস করাবার জন্যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখা হয়---অসহ্য তৃষ্ণায় সে ঘরের শুকনো মেজে চাটতে চাটতে বুক ফেটে মরে যায়। এই সমাজের বিধানেই আশি বছরের কুলীন তিনশো বিধবা রেখে গঙ্গালাভ করে---এই ব্রাহ্মণের নির্দেশেই সতীমেধের আদিম উল্লাস চলতে থাকে। ত্রৈলোক্যনাথের কালে এদের অনেক কিছুই বাস্তবে অবস্থিত ছিল, তারা তখন পর্যন্ত ইতিহাসে

পরিণত হয়নি। এ যেন বাঙালি জাতির বিশেষ করে বাংলা দেশের নারীর ওপরে হিংস্র সামাজিক অত্যাচারের একটি প্রতীক চিত্র।

সাধারণ সত্য হিসেবে গ্রহণীয় কিনা জানি না তবে এ কথা অনেকাংশেই স্বীকার্য যে বহির্মুখী অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি আমাদের জীবন-সম্পর্কিত মূল্যবোধকে বাড়িয়ে দেয় মমত্ব ও শুভচেতনকে উদ্‌বুদ্ধ করে। ভূয়োদর্শনের ফলে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে জীবন ও জগৎ পূর্ণতর রূপে উদ্ভাসিত হয়। রামমোহনের ভারত-সাধনার দীক্ষা হয়েছে এই বিপুল ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার দ্বারাই; রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের মহাজাগতিক রূপ তাঁর সুবিশাল অভিজ্ঞতার কেন্দ্র থেকেই বৃত্তায়িত; শরৎচন্দ্রের জীবনাসক্তি তাঁর বাহির-চারণা থেকে অনেকখানিই উৎসারিত; টল্‌স্টয় এবং গোর্কীর মানবতাবাদ তাঁদের ভূয়োদর্শনের মৃৎভূমি থেকেই প্রাণরস আহরণ করেছে। অনুশীলনে, অধ্যয়নে এবং হৃদয়বত্তার ব্যাপ্তিতে স্বল্প অভিজ্ঞতাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তা সমুচ্চ আদর্শের গৌরব লাভ করতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য থেকে যে প্রাণ-মমতা গড়ে ওঠে, তার মূল্য উত্তুঙ্গ আদর্শবাদের গরিমার চাইতে কম নয়। তাতে চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য না-ও থাকতে পারে, কিন্তু জীবনশিল্প হিসেবে তার সত্যতা ও সার্থকতা বিতর্কের অতীত।

জাতি এবং দেশ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত অতিভাষণ ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে হয়তো কোথাও নেই। তিনি প্রধানত গল্পকার এবং

রঙ্গ-ব্যঙ্গই তাঁর ব্যবহৃত মাধ্যম। তবু যে-পাঠক একটু সতর্ক-ভাবে তাঁর সাহিত্যকে অনুধাবন করবেন—তিনিই অনুভব করবেন সরস মজলিসী গল্পের উচ্ছ্বসিত কৌতুকের আড়ালে কী নিবিড় নিগূঢ় বেদনা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। তাঁর এই নেপথ্যবাহী অশ্রুধারা দেশ এবং জাতিব প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি থেকেই উৎসারিত। শিল্পধর্মে গোত্রগত পার্থক্য থাকলেও শিল্পিমানসের বিশ্লেষণে এদিক থেকে আরো তুজনের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা পাওয়া যায় : একজন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র কালীপ্রসন্ন সিংহ, আর একজন 'ভারত-উদ্ধার কাব্যের' কবি 'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ ২ ॥

এই প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের ছোট গল্পগুলিই আমাদেব বিশেষভাবে আলোচ্য। 'লুল্লু', 'বাঙ্গাল নিধিরাম'. 'বীরবালা' ও 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'—এই ক-টি তাঁর বড় গল্প। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য গল্প-সংগ্রহ হল 'মুক্তামালা,' 'মজার গল্প' এবং 'ডমরু চবিত'।

আমি বলেছি, ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে আমরা তুটি যুগকে দেখতে পাই। একটি ঐতিহ্যের—যেখানে লেখক বিশুদ্ধ গল্পবিলাসী ; –সেখানে রুপো-বাঁধানো ধূমায়িত হুঁকোটি হাতে নিয়ে তিনি জমাট গল্প বলতে বসেছেন। এ সেই বটতলার

'দা-ঠাকুরের গল্প'ধারার অনুবর্তন। ছোটোখাটো ঘরোয়া গল্প, বিদেশী গল্পের সরল ও সরস অনুবাদ। এদের মধ্যে 'শম্ভু ঘোষের কন্যা' এবং 'সে-কালের মোহর'-জাতীয় পারিবারিক 'নভেলেট্' আছে, বিলিতী টম্ সাহেবের 'ভূতের বাড়ীর' গল্প আছে এবং 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্পে'র কথিকাপঞ্চকে গুলির আড্ডার স্থানোচিত মহিমার পরিচয় আছে। 'মজার গল্প' নামেই সপ্রমাণিত--এই বইতে লেখক দস্তুরমতো আসর জমিয়ে বসেছেন এবং অনেকগুলি ভৌতিক আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার সারল্য ও সরসতা এবং রচনারীতির অন্তরঙ্গকুশলতা এদের মধ্যে থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথের স্বাতন্ত্র্য এখানে নিহিত নেই। সে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান মেলে 'মুক্তামালা'র সূচনাপর্বে, 'বীরবালা' ও 'লুল্লু'র অপূর্ব কাহিনীতে, 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'র বর্ণনায় এবং 'ডমরু চরিতের' আশ্চর্য গল্পগুলিতে। এমন কি 'কঙ্কাবতী'কে বাদ দিয়েও মাত্র 'ডমরু চরিতের' মাধ্যমেই ত্রৈলোক্যনাথ অমরত্ব লাভ করতে পারতেন।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায় বা দ্বিতীয় যুগটি স্বজাতি- ও -সমাজ-সমালোচনায় বিশিষ্ট। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ নিবারণে যে ত্রৈলোক্যনাথের প্রাণপণ প্রয়াস আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় পণ্যকে পৃথিবীর বাজারে উপস্থিত করবার জন্যে যিনি ব্যাকুল, দেশের পরম হিতব্রতী ব্যক্তিস্বার্থহীন প্রতিনিধি-রূপে যিনি ইয়োরোপের পথে যাত্রা করেছেন--দ্বিতীয়-পর্যায়ী গল্পগুলির মধ্যে সেই মানুষটির উপস্থিতিই আমরা উপলব্ধি করি।

রঙ্গ ও রসিকতার উপকরণে ত্রৈলোক্যনাথ আত্মসমালোচনা করেছেন সেই আত্মনিরীক্ষার দর্পণে দেশের অনেক গ্লানি, অনেক ভণ্ডামি, অনেক মিথ্যাচার প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়– ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সামসময়িক যুগের শিল্পী। তৎকালীন নবোদগত দেশপ্রেমকে এঁরা ব্যঙ্গ ও রসিকতার খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বজ্রগর্জন ও বিপিনচন্দ্র পালের দীপ্ত আবির্ভাবে দেশের রাজনীতিতে তখন ঝড় উঠেছে। এরই পাশাপাশি কয়েকজন কৌতুকরসিক "সার্বভৌমিক তিক্ততা ও গ্লানিবোধকে······হাসির উপাদানে রূপান্তরিত" * করে দিলেন। ইন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন তাঁর অপূর্ব 'ভারত-উদ্ধার' :

"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন),
আলু-ভাতে ভাত তবে দি চড়াইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনা করেছিলেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' আর 'মডেল ভগিনী'– পরিবেশন করেছিলেন 'কৌতুককণা'। মোটের ওপর স্বাধীনতার আন্দোলন তখন দেশের মুক্তি এবং

---

* শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' নামীয় মূল্যবান প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

আত্মসমালোচনার যে দ্বিমুখী ধারা আশ্রয় করেছিল, এই তিনজন ব্যঙ্গরসিক তাঁদের তির্যক শিল্পরীতির সহায়তায় সেই দুটিকেই প্রকাশ করেছেন।

ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় প্রচারধর্মিতা অতিমাত্রায় স্পষ্ট। তাঁদের সাহিত্য-প্রয়াসকে তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণ হিসেবেই ব্যবহার করেছিলেন। চিরন্তন রসসৃষ্টির মহিমচ্ছায়া তাঁদের কোনো কোনো রচনায় যে অল্প-সল্প পড়ে নি তা নয়—'ভারত-উদ্ধার কাব্য' এবং 'শ্রীশ্রীবাজলক্ষ্মী' তাব স্বাক্ষর বহন করে। তবুও এঁদের রচনা সামান্যই কালোত্তীর্ণ হয়েছে—সমকালীন যুগের প্রয়োজন চরিতার্থ করেই এরা ঐতিহাসিকের দপ্তরে পঞ্জীকৃত হয়েছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর উদ্দেশ্যকে রসসৃষ্টির সঙ্গে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করেছেন—তারা আগে শিল্প হয়ে উঠেছে তারপর প্রচার করেছে। "It must be work of art first"—এই সত্যটি ত্রৈলোক্যনাথের আয়ত্ত ছিল বলেই তাঁর রচনা কালজয়িতায় সার্থকতর।

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ প্রধানত দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক অপদার্থের দল এবং ব্রিটিশ শাসনের দিকে ধাবিত হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি ; আধুনিক শিক্ষা, বিদুষী নারী এবং ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁর ব্যঙ্গের উৎস—তাঁর রুচিও অভিনন্দনীয় নয়। ত্রৈলোক্যনাথের সমালোচ্য প্রধানত গ্রামীণ সমাজ আত্মশুদ্ধিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য—যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিক্রিয়াধর্মী মনোভঙ্গি তাঁর মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না।

ইন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন রুচির শুচিতাও তাঁর সর্বত্র অব্যাহত থাকে নি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ এঁদের চাইতে অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত, তাঁর জাতীয়তাবোধ সর্বভারতীয় (তাঁর উড়িষ্যায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন বা সামগ্রিক হিন্দী প্রচার কল্পনা স্মরণীয়), তুলনামূলকভাবে তিনি তাঁর অপর দুজন সমানধর্মার চাইতে অনেক বেশি প্রগতিশীল, তাঁর রুচি প্রায় নির্মল। আর সব চাইতে বড় কথা –যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে—অপর দুজন সাহিত্যকে প্রচারের বাহন করেছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথের প্রচারণা তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সুকৌশলে বিন্যস্ত। উদ্দেশ্যের কাঁটা তাঁর শিল্পাস্বাদনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে না, এমন কি সহজে তা অনুভবই করা যায় না।

॥ ৩ ॥

'মজার গল্প', 'মুক্তামালা', 'লুল্লু' ও 'বীরবালা'—এগুলিতে কিছু কিছু ভৌতিক ব্যাপার আছে। এদের মধ্যেও ত্রৈলোকানাথের ওই দ্বৈত অধ্যায়ের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি, সতী হাসে ফিকি ফিকি', 'কেন এত নিদয় হইলে' অথবা 'ভূতের বাড়ী' পুরোনো বৈঠকী গল্প—অর্থাৎ গল্পের জন্যেই গল্প। কিন্তু ভূত-সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের প্রকৃত মনোভঙ্গি অন্যত্র লভ্য। যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ

বস্তুত ভূত এবং ভৌতিকতাকে পরিহাস-জল্পনার প্রয়োজনে ও রূপকার্থেই ব্যবহার করেছেন। ভূতসংক্রান্ত ব্যঙ্গের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় 'কঙ্কাবতী'তে যেখানে স্কাল ও স্কেলিটন ভূতের সঙ্গে খেতুর আলাপ চলছে :

"আচ্ছা! মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়?"

স্কাল উত্তর করিলেন, "কেন? ভূত মরিয়া মারবেল হয়? সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মতো মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে।"

ভূত-সম্পর্কে যুক্তিবাদী ত্রৈলোক্যনাথের মূল বক্তব্য নিচের উপাদেয় উদ্ধৃতিটি থেকে আরো স্পষ্ট হবে :

"এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠিল! বিজ্ঞানবেত্তারা, বিশেষতঃ ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়টি অনুধাবনা করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে অল্পস্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পূরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব সস্তা হয়। এক পয়সা, দুই

পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। সস্তা হইলে গরীব-দুঃখী যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।" (লুল্লু—চতুর্থ অধ্যায়)

বস্তুত, বাংলা দেশে ভূত ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদীন ধরে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির যে প্রবর্তন প্যারীচাঁদ মিত্র ইত্যাদি করেছিলেন, মাদাম ব্লাভাট্স্কি যে অতীন্দ্রিয় জীবনের প্রচারে নেমে পড়েছিলেন –সে-সবের প্রভাব তখন দেশের একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। সিয়াঁস, মিডিয়াম, আত্মা-নামানো —এগুলো তখন যুগের ফ্যাশান, কলকাতার উচ্চবিত্তদের তেপায়া টেবিলে পরলোকগত ব্যক্তিরা নিয়মিত তখন খোসগল্প করতে আসতেন। ত্রৈলোক্যনাথের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মন সঙ্গতভাবেই শিক্ষিতজনের এই তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক ভূত চর্চা'র দুর্বুদ্ধিকে আঘাত করবার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। 'ভূত-তত্ত্ববিৎ' পণ্ডিতদের উল্লেখে তিনি এই থিয়োসফিস্টদেরই আক্রমণ করেছেন।

আর একদিকে ত্রৈলোক্যনাথের ভূত রূপক। বাংলা পত্র-পত্রিকার একজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন সাংবাদিকতা এবং তাদের কুরুচিপূর্ণ কটুভাষণ সেকালের বহু সংস্কৃতিবানকেই বেদনা দিত। 'লুল্লু'র উদ্ভট কাহিনীতে আগাগোড়া ভূতকে যে কেবল ব্যঙ্গ করা হয়েছে তাই নয়, বস্তুত ভূতের আসল সার্থকতা কোনখানে তা ত্রৈলোক্যনাথ এই ভাবে বলে দিয়েছেন :

আমীর বলিলেন, –"আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি ; সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদকের প্রয়োজন। ……তোরে মনে করিয়াছি সম্পাদক করিব।" গোঁ গোঁ বলিল, –"আমি যে লেখাপড়া জানি না।" আমীর বলিলেন,—"পাগল আর কি। লেখাপড়া জানার আবশ্যক কি ? গালি দিতে জানিস তো ?" গোঁ গোঁ বলিল,—"ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন,—"তবে আর কি! আবার চাই কি ? এত দিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত সব খরচ হইয়া গিয়াছে ; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।" (লুল্লু)

আমীর কথা রেখেছিলেন। কাহিনীর শেষে আমীর সংবাদপত্র প্রকাশ করে গোঁ গোঁ ভূতকে তার সম্পাদকের পদে বসিয়ে দিলেন। তার পরিণতি হল এইরকম :

"একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের দুই পয়সা লাভ হইল। গোঁ গোঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটিতে লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্রের আফিসেই তাঁব অদৃশ্য ভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে

বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁ গোঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপিয়া বসেন—”

ভূত-সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের আতিশয্যের উদ্দেশ্য উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই সুস্পষ্ট হবে। মাদাম ব্লাভাট্স্কির বিরাট ‘hoax’ নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক বিতর্ক করেছেন, ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের আঘাত তার চাইতে কম ফলপ্রসূ হয় নি। আর এই ভূতের ওপর দিয়ে অনেক মনুষ্যরূপীর প্রতি ত্রৈলোক্যনাথ নিজের রূপক আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। সম্পাদক-প্রসঙ্গ আমরা শুনেছি, ভূতের ধর্মবোধ প্রসঙ্গ শোনা যাক :

“আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকা-ভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না—”

কালাপানি পার হলে ধর্মহানির যে বিভীষিকা আমাদের মাথার ওপর সে-যুগে উদ্যত থাকত, এ ব্যঙ্গ তারই প্রতি। ত্রৈলোক্যনাথের বিলাতযাত্রার প্রথম বারে যাঁরা জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন—এই ব্যঙ্গবাণ তাঁদেরই মর্মস্থানের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত।

ত্রৈলোক্যনাথ হাস্যরসের শিল্পী। কৌতুক এবং রঙ্গ—হাসির এই দুটি চেহারা। সাধারণ ভাবে বিদগ্ধ রুচিবান লেখকের রচনায় কৌতুক মুখ্য, অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সংস্কৃতিহীন লেখকের রচনায় রঙ্গ প্রধান। শ্লেষ এদের উভয়কে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে এদের দুটিকেই আমরা সমভাবে দেখতে পাই। যেখানে বাঙালির অতীত বৈঠকী ঐতিহ্যের অনুসরণ, সেখানে তিনি রঙ্গকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন। এর উদাহরণ, গুলির আড্ডার গল্পগুলি—যথা 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প' অথবা 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় যমলোকে মিত্রজা ও নেইআকুড়ে দাদার বিপর্যয় ঘটানোর কাহিনী, এঁড়েগরু-বিতাড়িত যমরাজের শোচনীয় দুর্গতি fun-এর চূড়ান্ত নিদর্শন। 'লুল্লু' মূলতঃ wit-নির্ভর—একটি অদ্ভুত কাহিনী এর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও চমকপ্রদ মন্তব্য এবং তির্যক অর্থবিন্যাসে এই গল্পটি প্রথমশ্রেণীর কৌতুক-সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমীরের চণ্ডুসেবনের বাঁশের নলটির অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ :

"ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজি-বিজিগুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু সেগুলি

অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,—চীনে ভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—'চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কাজে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা।...মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।' যাহা হউক, আমীর যে নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল —তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরৎ লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া চীনের উত্তর সীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত...মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে নলটি আমীরের মনোনীত হইয়াছিল।"

Wit হিসেবে উদ্ধৃতিটি অসামান্য। 'ভূতের কল' তৈরী করবার প্রস্তাবটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'মুক্তামালা' বইটির সূচনাপর্ব এবং 'ডমরু চরিত' গল্প-সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের অবিস্মরণীয় দান। উদ্ভট কল্পনার নিরঙ্কুশ উদ্দামতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের তীক্ষ্ণ ও সরস সমালোচনায় এরা যে সাহিত্যবস্তু পরিবেশন করেছে, তার আস্বাদন অন্যত্র অলভ্য। বিশেষভাবে 'ডমরু চরিত' তুলনারহিত।

RAJA BIR BIKRAM COLLEGE
5080
LIBRARY.

ডমরুধর এই গল্পগুলির কথক। এর পূর্বাভাস আছে 'জ্ঞানবান্ সর্পে'র তিনুর মধ্যে। কিন্তু তিনুর বিশুদ্ধ fun এই গল্পমালায় উজ্জ্বল wit-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উপমা দিয়ে বলা যায়—'ডমরু চরিতে' রঙ্গের মেঘখণ্ড কৌতুকের সূর্যালোকে রঞ্জিতপ্রান্ত হয়ে শ্লেষের বজ্রকে মর্মলোকে বহন করেছে।

এই ডমরুধর একটি অসামান্য চরিত্র। বয়সে বৃদ্ধ, চেহারা কালো এবং কদাকার, স্বার্থের প্রয়োজনে সর্ববিধ নীতিবোধ-বিবর্জিত। ডমরুধর তাঁর বন্ধু লম্বোদর ও শঙ্কর ঘোষ ইত্যাদির কাছে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাতটি পর্বে বর্ণনা করেছেন। গল্পের সংখ্যা সাতটি হলেও এরা প্রত্যেককেই নানা অধ্যায়ে বিভক্ত, একটি গল্পের মধ্যে অনেকগুলি শাখাগল্প বিকীর্ণ।

রচনার মুন্শীয়ানার দিক থেকে 'ডমরু চরিতের' উৎকর্ষ 'কঙ্কাবতী'র চাইতেও বেশি। এই বইটিতে ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। লেখকের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে রঙে রসে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনীর অপূর্বতার সঙ্গে রঙ্গ-কৌতুকের সমাবেশ এবং ভাষার বহতা-স্বাচ্ছন্দ্য বইটিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে পরম উপভোগ্য করে তুলেছে।

একজন বক্তার মুখ দিয়ে উদ্ভট সরস গল্প পরিবেশনের কলারীতি প্রাচীন প্রাচ্য প্রথার অনুস্মৃতিতে পৃথিবীর নানা সাহিত্যেই ইদানিং প্রচলিত হয়েছে। আধুনিক ইংরেজিতে

Wodehouse-এর *Mulliner's Nights*-এ Mr. Mulliner কতকগুলি রঙ্গ-বিচিত্র উপাদেয় গল্প তাঁর শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন। বাঙালি পরশুরামের কেদার চাটুজ্জেকে কোনোদিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। 'সম্বুদ্ধ' তাঁর বিখ্যাত শিকারী কান্তি চৌধুরীকেও বাংলার রস-সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছেন।

কিন্তু ডমরুধর এঁদের প্রত্যেককে ছাপিয়ে উঠেছেন। Mulliner এই আজগুবি রস কল্পনাও করতে পারেন না, কেদার চাটুজ্জের কিছুক্ষণের মধ্যেই দম ফুরিয়ে আসে, বেশিক্ষণ জের টানতে পারেন না; কান্তি চৌধুরীর অভিজ্ঞতা শিকারী জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ডমরুধর সর্বশক্তিমান; ইহলোক, পরলোক, বাঘ, কুমির, ভূত, সুন্দরবনের চড়ুই পাখির মতো মশা, যমপুরীর অভিজ্ঞতা, রাহুর কামড় কিছুই তাঁর বাকী নেই। তাঁর কল্পনা যে কতখানি উদ্দাম, সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে বাঘের চামড়ায় প্রবেশ করবার কাহিনীতেই তার নিদর্শন পাওয়া যাবে:

"বাঘ পালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পালাইতে পারিল না। অসুরের মতো বাঘ যেরূপ বল-প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, যাঃ! লেজটি বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি-মাংসের

দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নাই। পাকা আমের নিচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল।...মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।...ব্যাঘ্রশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম সেইস্থানে পড়িয়া রহিল।...আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘছালের মধ্যে আমি প্রবেশ করিলাম।" (প্রথম গল্প)

একটিমাত্র নমুনা দিয়ে মন তৃপ্তি পায় না সমগ্র 'ডমরু চরিতকে' উদ্ধৃত করবার প্রলোভন জাগে। সে চেষ্টা করে লাভ নেই। গল্পের অপরূপ fun-এর সর্বত্র wit-এর মণিমুক্তায় খচিত, আর তার অন্তরালে সমাজ-সমালোচনার তীব্র satire-এর প্রবাহ। ত্রৈলোক্যনাথের দেশহিতৈষণা ও সমাজকল্যাণের প্রেরণা থেকেই সেই শ্লেষের উৎসার।

হিন্দুধর্মের অর্থহীন আচার-আচরণের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের মর্মভেদী আক্রমণ যমপুরীর একটি বিচারদৃশ্যে চমৎকার প্রতিভাত হয়েছে। একটি পরম পুণ্যবান, ধার্মিক, সত্যবাদী ও পরোপকারী আত্মার বিচারফল শেষ পর্যন্ত এই রকম :

"যম নিজে সেই লোকটিকে জেরা করিতে লাগিলেন—'কেমন হে বাপু! কখনও বিলাতি বিস্কুট খাইয়াছিলে?'

সে উত্তর করিল—'আজ্ঞা না।'

যম জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিলাতি পানি? যাহা খুলিতে ফট করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?'

সে উত্তর করিল,—'আজ্ঞা না।'

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সত্য করিয়া বল, কোনোরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কিনা?'

সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল,– 'আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।'

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর। ইহাব পূর্বপুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহা-দিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ কর। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্যন্ত সেই নরকে যাইবে। চিত্রগুপ্ত! আমার এই আদেশ তোমার খাতায় লিখিয়া রাখ।'

...এই বার আমার বিচার। কিন্তু আমার বিচার আরম্ভ হইতে না হইতে আমি উচ্চৈস্বরে বলিলাম,-- 'মহারাজ! আমি কখন একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই।'

আমার কথায় যম চমৎকৃত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি বলিলেন, 'সাধু সাধু! এই লোকটি একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু সাধু! এই মহাত্মার শুভাগমনে আমার যমালয় পবিত্র হইল। যমনীকে শীঘ্র শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাদিগকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন,—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত,

পারিজাতপরিশোভিত কোকিলকুহরিত, অপ্সরাপদ-নূপুরঝুনঝুনিত হীরা-মাণিক-খচিত নূতন একটি স্বর্গ নির্ম্মাণ করিতে বল।' ”

উদ্ধৃতিটি স্বয়ংসিদ্ধ। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

ভক্ত দেশপ্রেমিক ও স্বদেশী বক্তাদের চরিত্র ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' ও 'ভলান্টিয়ারী কাব্যে' আছে। ত্রৈলোক্যনাথও নিজস্ব পদ্ধতিতে এদের উদ্‌ঘাটন করেছেন। ডমরুধরের 'অশ্বাণ্ড-ভ্রমণে' (এটি ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে আর একটি জগৎ) একটি স্বদেশী ছেলেখেকো বক্তার রূপ এই রকম :

“কানে আঙ্গুল দিয়া ইঁহার নিকট আমি গমন করিলাম। ইঁহার অপর কেহ শ্রোতা ছিল না। কিন্তু একখণ্ড অন্ধকারের উপর দাঁড়াইয়া রাত্রিদিন ইনি বক্তৃতা করেন। শুনিলাম যে, পাতালে অসুরদিগের কানের পোকা হইলে, তাহারা ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিটকাল ইঁহার বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই কানের পোকা ধড়ফড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।” (চতুর্থ গল্প)

'ডমরু চরিতের' প্রায় সর্বত্রই এই জাতীয় নিদর্শন পাওয়া যাবে। স্বদেশী কোম্পানীর নামে জাল-জুয়াচুরি, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সাফল্য, গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার ও কুশ্রীতা—এদের কোনোটিকেই ত্রৈলোক্যনাথ ক্ষমা করেন নি। ব্যাপক অভিজ্ঞতার মুক্ত দৃষ্টিতে, দেশপ্রেমের হিতৈষণায় এবং আত্ম-সমালোচনার নির্ম্মমতায় ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য সে-যুগের প্রগতিপন্থী চিন্তাধারার অনেকখানিই বহন করে এনেছে।

তাই কেবল অপূর্ব প্রসাদগুণমণ্ডিত রসোজ্জ্বল ভাষায় জমাট গল্প বলবার মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব নিহিত নেই—তাঁর কল্যাণবুদ্ধি ও দেশাত্মবোধ তাঁকে মহৎ শিল্পীর গৌরব দান করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পরীতি সম্পর্কে দু-একটি কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আধুনিক ব্যঞ্জনামুখ্য ঐকসংকটাশ্রয়ী ছোট গল্প তিনি লেখেন নি -তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। এদিকে থেকে তিনি প্রাচ্যরীতিরই ধারাবহ। কোনো শান্তস্রোতা নদীর ধারে, বিরাট কোনো ন্যগ্রোধছায়ায় অজিনাসীন বিষ্ণুশর্মা যে ভাবে গল্পের পর গল্পের জাল বুনে গেছেন; মধূখ-বর্তিকার আলোয় কুটির-প্রাঙ্গণে বসে যে-ভাবে ভূর্জপত্র পুঁথি থেকে গল্প শুনিয়েছেন সোমদেব—ত্রৈলোক্যনাথের পদ্ধতিও তাই। খেজুর বনের কর্কশ পত্রমর্মরে, সন্ধ্যাবিকীর্ণ আরব মরুভূমির পটভূমিতে কিসমিস্ আর গড়গড়ার আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর যে গল্প শুনেছেন বার্টন; 'ভ্যালি অব্ দি কিংসে'র মমির নিশ্বাসতপ্ত মরুবাতাসে, তারার আলোয় রহস্যপ্রদীপ্ত পিরামিডের মহিমচ্ছায়ায়, যাযাবরী তাঁবুতে 'সিন্দবাদ নাবিকে'র যে অপরূপ কাহিনীমালা রচিত হয়ে উঠেছে—ত্রৈলোক্যনাথ তারই অনুবর্তী। তাই সেই বিশিষ্ট 'Oriental' মনোভঙ্গিতে তাঁর গল্প শ্লথগতি, বিলম্বিত ছন্দ, সম্ভব-অসম্ভবের জগতে স্বেচ্ছাবিহারী।

শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের একটি চোখে আলাদীনের প্রদীপের মায়াকজ্জল, আর একটি চোখে সজাগ সমাজবীক্ষা। তাঁর গল্প-

সাহিত্যে এই দুইয়েরই যৌগিক রূপ। আর এই আশ্চর্য কথা-সাহিত্যকে আরো উপাদেয় করে তুলেছে তাঁর মৌখিক বিবৃতির মতো সহজ অন্তরঙ্গ কথনকৌশল—মুহূর্তের মধ্যে যা পাঠককে ত্রৈলোক্যনাথের আসরে মুগ্ধ শ্রোতার আসনে বসিয়ে দেয়।

বাংলা গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের চাইতে বড় স্রষ্টা এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মতো কেউই আর কোনোদিন আসবেন না। সে সামাজিক অবস্থার পুনরাবর্তন আর সম্ভব নয়। 'Ideal' এবং 'Real'-এর দ্বন্দ্বে বারে বারে কৌতুক-রঙ্গ-শ্লেষ-রসিকের আবির্ভাব ঘটবে ; কিন্তু বাঙালির ফরাস-বিছানো বৈঠকখানায় গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে এমন গল্পের আসর ভবিষ্যতে আর কেউই জমাতে পারবেন না, তাই ত্রৈলোক্যনাথের মতো গল্পকথকেরও আর জন্ম হবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো সমালোচকই চিরদিন ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যাবেন—তার দ্বারা বাঙালির রসবোধ এবং ঐতিহ্যনিষ্ঠাই প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

“সহজ সুরে সহজ কথা”

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়]

॥ ১ ॥

অন্তত চার দশক আগেও বাংলা সাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের বিশাল অভ্যুদয়ে তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতির দিকটা কিছু পরিমাণ ম্লান হলেও ১৩৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য জনপ্রীতি অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করে গেছেন। তার অন্যতম কারণ ছোট গল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ উৎসাহ ছিল না, জগদীশ গুপ্ত এবং শৈলজানন্দ প্রমুখ কীর্তিমানেরা তখনো সর্বজনীন রুচির প্রসাদ লাভ করতে পারেন নি বা স্বমহিমক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য গল্পগুলির অধিকাংশই এর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে—কিন্তু তাদের পঠনও ব্যাপক নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য mystic এবং অবোধ্য—এই মূঢ় ভাবনা তখন পর্যন্ত সাধারণ পাঠক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত -দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর গল্পসাহিত্যকেও এই কুসংস্কারের দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে দীর্ঘকাল।

তা ছাড়াও রবীন্দ্রমননের ব্যাপ্তি, তাঁর বাগ্‌রীতির তির্যক বৈদগ্ধ্য, সৌন্দর্যানুভূতির সুকোমল সূক্ষ্মতা এবং মনস্তত্ত্বের বঙ্কিম

লীলা তখন পর্যন্ত গল্পবিলাসী সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুব উপাদেয় ছিল না। তখনও রবীন্দ্রনাথ 'select readers'এর লেখক। আরো একটি কারণে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি জনমনের প্রসন্নতা তখনো অনুপস্থিত। 'নষ্টনীড়ে' তিনি আমাদের সামাজিক আত্মতৃপ্তিতে যে আঘাত দিয়েছিলেন, সে-আঘাতের জ্বালা আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল পরবর্তী 'পয়লা নম্বরে' এবং 'স্ত্রীর পত্রে'। শেষোক্ত গল্পটি বাংলার সাহিত্য-সংসারে যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল, তার স্মৃতি এখনো সুদূর নয়।[১] 'নারায়ণ' ইত্যাদি পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের তীব্রতম সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ 'immoral' -এই 'সত্য'টি প্রমাণ করবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কোমর বেঁধে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাধারণ পাঠক ছাড়াও শিক্ষিত সমাজের মধ্য থেকে এমন অভিযোগও উঠেছিল : "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। ক্রমে কথাটা আরো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইল এবং প্রতিপক্ষ বলিলেন যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে।"[২]

অতএব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অভিযোগ ছিল ত্রিমুখী। তাঁর কাব্যের 'মিস্টিসিজম' দুর্বোধ্য, তাঁর রচনা সমাজবিরোধী ও

১ বিপিনচন্দ্র পাল 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'মৃণালের পত্র', অধ্যাপক ললিত বন্দোপাধ্যায় 'স্বামীর পত্র' নামে এই গল্পের জবাব লেখেন। —রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২ ঐ

নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত এবং তিনি অবাস্তব সাহিত্যের স্রষ্টা। এই ব্যাপক রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অপরূপ ছোট গল্পের স্বাদ থেকেও পাঠক-রসনাকে বহুলাংশে বঞ্চিত করে রেখেছিল।

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলির প্রেক্ষাভূমিতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত এই আলোচনাটুকু অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'Nature abhors Vacuum'—এই সত্যটি নিষ্পন্ন করবার জন্যেই যেন মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে প্রভাতকুমারের অভ্যুদয় হয়েছিল। তাঁর সামসময়িক ও সমানধর্মা অন্যান্য প্রত্যেক গল্পলেখকের চাইতে তিনি ছিলেন অনেক বেশি শক্তিমান। চমৎকার প্রসাদগুণ-মণ্ডিত ভাষায় তিনি ছোটখাটো জিনিসগুলিকেও উপভোগ্য গল্পে পরিণত করতে পারতেন, climax রচনায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল, সিচুয়েশন সৃষ্টির কৌশল ছিল তাঁর অধিগত এবং চকিত একটি বিদ্যুচ্ছটায় এক অপরিচিত ভাবজগৎকে উদ্ভাসিত করবার বা হৃদয়ের গভীরতমচারী রহস্যলোককে তেমন ভাবে আবিষ্কার করবার ক্ষমতা না থাকলেও তিনি ছোটখাটো হাসিকান্নাগুলিকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত করতে পারতেন। বিশেষ করে সুবিন্যস্ত 'সিচুয়েশনে'র সাহায্যে জীবনের লঘু অংশগুলিকে তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতেন।

উচ্চশিক্ষা এবং বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তাঁর গল্পের নিপুণ আঙ্গিক রচনায় সাহায্য করেছিল। ইংরেজিতে যাকে 'Precision' বলা হয়—প্রভাতকুমারের গল্পে তার খুব ভালো

নিদর্শন মেলে। রচনাগত এই কৃতিত্বের জন্যেই সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী তাঁকে মপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এক সময় তাঁকে বাংলা গল্পের মপাসাঁ বলা হত।

কিন্তু মপাসাঁর সঙ্গে প্রভাতকুমারের সাদৃশ্য মাত্র আঙ্গিকেই - তার অতিরিক্ত কিছু নয়। প্রকৃতিবাদী মপাসাঁ তাঁর সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু ফ্রান্সের অন্তর-বাইরের গ্লানিকে "expose" করবার ব্রত নিয়েছিলেন। সামন্ততন্ত্র ও সামাজিক উচ্চতলবিহারী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ফরাসী-বিপ্লবের ব্যর্থতার সমস্ত বিষ-জ্বালা নিয়ে উৎফণারূপে দেখা দিয়েছিল। নীতি, সমাজ বা ধর্মবোধ সম্পর্কে তাঁর মানসিক গঠন ছিল শিশুর মতো অপরিণত। মাত্র তিনটি লক্ষণের দ্বারা সমালোচকেরা তাঁর মনোজগৎকে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন: 'Individualism, Scepticism, Elementalism'।

উচ্চচর সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোগত ক্ষোভ এবং বিরূপতা যেমন একদিকে চরম তিক্ততার স্বাক্ষর এঁকে রেখেছে, অন্যদিকে আর একটি ক্ষেত্রে একটি সুস্থ, সবল ও প্রাণবন্ত মপাসাঁকে আমরা দেখতে পাই। উন্মুক্ত প্রান্তর, শিকারের বিস্তৃত জলজঙ্গল, নরম্যাণ্ডির কৃষকের আদিম বলিষ্ঠতা, সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম (The Vagabond) অথবা মরুভূমির জান্তব-প্রেম (Marocca) মপাসাঁর সাহিত্যে একটা rustic প্রাণোল্লাস এনে দিয়েছে। 'How he got the legion of honour' প্যারীর অসুস্থ ক্লেদে আচ্ছন্ন, কিন্তু 'Marocca' র

জৈব-প্রেম মরুভূমির আগ্নেয় উত্তাপের মতোই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের মাদকতা বয়ে আনে। সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্বের জন্যেই 'Simon's Pa' এমন আশ্চর্য প্রাণসম্পদে বিভূষিত। তাই উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপতায় এবং জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধে মপাসাঁর সঙ্গে কারো যদি অন্তরের সমধর্মিতা থাকে, তবে তিনি এ-কালীন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নন।

মপাসাঁর গল্প এই দুই দিক থেকেই চরম-পর্যায়ী— extremist ; আর এই extreme মনোবৃত্তি নেই বলেই প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তা এমনভাবে অর্জিত হয়েছিল। বস্তুত লেখক হিসেবে প্রভাতকুমাব এবং মপাসাঁর সন্নিহিতি তো দূরের কথা, তাঁরা একেবারে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে বাস করেছেন।

মপাসাঁ সমাজ, ধর্ম ও নীতিকে নির্মমভাবে ভাঙতে চেয়েছেন, প্রভাতকুমার সযত্নে তাদের পক্ষপুটে লালন করেছেন ; রবীন্দ্রনাথকে দেখেই তাঁর সুপ্রচুব অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সুতরাং তিনি 'নষ্টনীড়' বা 'স্ত্রীর পত্রে'র কোনো বিপজ্জনক ফাঁদে পা বাড়ান নি—বরং 'সিন্দূর-কৌটায়' সুশীর কপালে সিঁদুর পরিয়ে দ্বিপত্নীত্বের হিন্দু আদর্শ স্থাপন করেছেন। মপাসাঁর কৌতুক ব্যঙ্গের ছুরির ফলায় সমাজকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছে, প্রভাতকুমারের কৌতুক সামাজিক স্বীকৃতির অক্ষয়বটের প্রাচীন ছায়ায় সহজ সরল প্রমোদরসে উচ্ছলিত হয়েছে। নরম্যাণ্ডির

কৃষক, নীচুতলাব মানুষ এবং 'অরুগ্ন-বলিষ্ঠ-হিংস্র নগ্ন বর্বরতার' জীবনোল্লাস প্রভাতকুমারের দৃষ্টি-সীমার বহির্ভাগে। 'Maupassant invites a select company, or else a very tolerant one'; আর প্রভাতকুমারের সাহিত্যে সকলের অবাধ উদার আমন্ত্রণ। মপাসাঁ জ্বালাতে জানেন, প্রভাতকুমার ভোলাতে জানেন। তাই বলা যেতে পারে, প্রভাতকুমার যদি উত্তর মেরুর অধিবাসী হন, তা হলে মপাসাঁ দক্ষিণ মেরুর বাসিন্দা।

আঙ্গিকের নিপুণতা বা বহুপ্রসবিতাব দিক থেকে প্রভাতকুমারকে যদি প্রমথ চৌধুরী মপাসাঁব সমপর্যায়ী বলে তুলনা করে থাকেন, তা হলে সে-কথা আলাদা। নইলে শিল্প-মানসের বিচারে এ-দুজনকে সমানধর্মা বলা মপাসাঁ বা প্রভাতকুমার কারো ওপরেই সুবিচার নয়।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পাঠকের মধ্যে যে 'শূন্যস্থান' ছিল, প্রভাতকুমার সেইখানে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এ-কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি কোনো সংস্কার ভাঙেন নি, কোনো নতুন সত্য সন্ধান করেন নি, জীবনকে বিচার করবার ও প্রশ্ন করবার যে বলিষ্ঠ দুঃসাহস প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকের আছে - প্রভাতকুমারের মধ্যে তার স্বল্পতা সহজেই

অনুভবনীয়। প্রতিটি প্রধান ছোটগল্প-লেখক যে 'Individuality'র অধিকারী, যে 'Personality'তে শেখভ-মপাসাঁ-রবীন্দ্রনাথ-গোর্কী-জয়েস-হেমিংওয়ে দেদীপ্যমান—প্রভাতকুমারের মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্য-রেখাঙ্কিত অনন্য ব্যক্তিত্বকে আমরা পাই না। কিন্তু 'great' না হলেও তিনি 'good'—তাঁর কৃতিত্ব সেইখানেই।

সমাজস্থিতির প্রতি আনুগত্য এবং জীবনের লঘু অংশকেই প্রধানত আশ্রয় করা—স্বাভাবিকভাবেই প্রভাতকুমারকে শিল্পী-রূপে সীমিত করে ফেলেছে। তাই আংশিকভাবে 'আদরিনী' এবং 'দেবী' গল্পটি ছাড়া কোনো 'great short story' তিনি আমাদের জন্যে রেখে যেতে পারেন নি। আক্ষেপ অবশ্য নিরর্থক। আম্রকুঞ্জে দ্রাক্ষার প্রত্যাশী হয়ে লাভ নেই। 'কী পাই নি' তার হিসেব মেলাবার জন্যে বিব্রত থাকলে 'কী পেয়েছি' তা কখনোই জানবার সুযোগ ঘটে না।

গল্প বলবার একটা সহজাত ক্ষমতা, Precision এবং ঘটনা-সংস্থানের সুকৌশলে প্রভাতকুমার সহজেই পাঠকের চিত্তে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পের আকর্ষণ অসামান্য। প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থ যে-কোনো মানুষের পক্ষেই চিত্ত-বিনোদনের অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ। তাঁর কৌতুকরস আমাদের কাছে নির্মল হাসির উপচার বহন করে আনে, তাঁর কারুণ্য আমাদের হৃদয়ের ওপর কিছুক্ষণের জন্যে মেঘছত্র মেলে ধরে। তাই তাঁর গল্প বার বার পড়া যায়। তারা আমাদের মনে কখনো

দস্যুর মতো প্রবেশ করে না, ভেঙে-চুরে একাকার করে দেয় না, আমাদের রক্ত-নাড়িতে ঝড় তুলে বিপর্যয় ঘটায় না।

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পে স্থায়ীভাব হল শান্তি। হাসি-কান্নার বর্ণ-বিচিত্রতা তার শুভ্রতাকে মধ্যে মধ্যে রঞ্জিত করে তুলেছে। আম-জাম-শিমূল-পলাশের ছায়ার তলা দিয়ে তাঁর গল্প গ্রামের ছোট নদীর মতো বয়ে চলেছে—রবীন্দ্রনাথের পদ্মার দার্শনিক বিস্তৃতি তাতে নেই; তাতে কখনো কখনো হয়তো বানও ডাকে—কিন্তু পদ্মার মতো দুকূলপ্লাবী রুদ্রতা তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

কৌতুক এবং রঙ্গ—wit এবং fun—প্রভাতকুমারের ছোট গল্পে সমানভাবে পরিকীর্ণ। শ্লেষও কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু তীব্রতা নেই। যুগের কোনো যন্ত্রণা বা সমাজের সঙ্গে Individuality-র কোনো সংঘর্ষ তাঁর মধ্যে না থাকায় তাঁর শ্লেষ কখনো চাবুকে পরিণত হয় নি। তাঁর কৌতুকের ভেতরে ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুত কল্পনা এবং রূপকেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি শান্ত, স্নিগ্ধ, সংযত, আত্মতৃপ্ত।

মার্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজানুগত্য প্রভাতকুমারের গল্পে একটি বিনম্র শোভনতা এনে দিয়েছে। তাই তাঁর কৌতুকে তড়িচ্ছটার খরধার না থাকলেও মুগ্ধকর ঔজ্জ্বল্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'প্রণয় পরিণাম' গল্পটি স্মরণ করা যাক। হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র চোদ্দ বছরের মানিকলালের

খেলার সাথী এগারো বছরের কুসুমের প্রেমে পড়া এবং তার পরম উপভোগ্য পরিণাম গল্পটির বিষয়বস্তু। রচনার মুন্শীয়ানায় এবং wit-এর দীপ্তিতে গল্পটি মনোরম। গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তে পাড়তে কুসুমকে দেখা, তার প্রেমে পড়া এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া এই রকম :

"তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক কাঁচা পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোষো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সেদিন রবিবার ছিল, স্কুলে যাইতে হইবে না। আহতবৎ মন্থরপদে বাড়ী আসিয়া মাণিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। পড়িবার জন্য? হায়, না, পুড়িবার জন্য, চিন্তার অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্য। শতরঞ্জ বিছান মেঝেতে ওয়েব্‌স্টার ডিক্সনারি মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাণিকের বয়স চতুর্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া বটতলার 'পারুলবালা', 'সোহাগিনী', 'বউরানী' প্রভৃতি কিছুই আর বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মাণিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে আর ধরিতেছে না উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। 'কেন দেখিলাম! হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম তো মরিলাম না

কেন? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার—কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে—হায় কতদিনে’?—ইত্যাদি ইত্যাদি।”

এ আগুন নিভতে অবশ্য বেশিদিন সময় লাগে নি এবং সেটা নিভেছিল বাপ ডাক্তার নন্দ চৌধুরীর প্রহার-ক্রমে। এর গল্পাংশ যৎসামান্য—গল্পেও বিশেষ কোনো নতুনত্ব নেই। কিন্তু লেখাটি জমে উঠেছে wit-এর অপূর্ব কারুকৌশলে, মন্তব্যের সরসতায় এবং চরিত্রসৃষ্টির স্বাভাবিকতায়। নীরব কবি এবং নীরবতর প্রেমিক প্রভাসের তুলনা নেই। নিছক wit-কে আশ্রয় করে কী অপরূপ অথচ কত সহজে একটি গল্প গড়ে তোলা যায়—সেদিক থেকে এটিকে স্ট্যাণ্ডার্ড বলে মনে করা যেতে পারে। ‘প্রণয় পরিণামের’ শেষাংশ এই রকম :

“ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহ-খানেক স্কুলে গেল না।”

এই জাতীয় সরস কৌতুকেই প্রভাতকুমারের গাল্পিক প্রতিভা সব চাইতে উৎকর্ষ লাভ করেছে। Fun বা রঙ্গের ক্ষেত্রেও তিনি সিদ্ধ শিল্পী। অপ্রত্যাশিত সিচুয়েশন সৃষ্টি করে তার

মধ্যে রঙ্গের প্রবাহ উদ্বেলিত করতে প্রভাতকুমার বিশিষ্ট কলাকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনা-সংস্থান অপ্রত্যাশিত হলেও তাতে প্রায়ই অস্বাভাবিকতা নেই। প্রভাত-কুমারের মিতিবোধ ও সংযম কখনো উৎকল্পনাকে অবলম্বন করে নি এবং সেই সঙ্গে সুরুচিবোধের সতর্কতা তাঁর রঙ্গ-রচনায় কখনো ভাঁড়ামিকেও প্রশ্রয় দেয় নি। 'মাস্টার মহাশয়' গল্পের 'I do not know'র পরিণতি রঙ্গসৃষ্টির দিক থেকে অপ্রত্যাশিত স্বাভাবিকতা ও সরল সরসতার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রঙ্গ-রচনায় প্রভাতকুমারের 'বলবান জামাতা' একটি স্মরণীয় গল্প। শ্যালিকার ধিক্কারে নবনীত-কোমল জামাতার উত্তেজিত চিত্তে ব্যায়ামচর্চা, ক্রমশ পালোয়ান হয়ে ওঠা, লাঠি এবং বন্দুক নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, নামগত বিভ্রান্তির ফলে অন্যের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছনো ও পরিশেষে তার রসোজ্জ্বল পরিণতি প্রভাতকুমারের 'সিচুয়েশন'-সৃষ্টি-নৈপুণ্যের নির্ভুল পরিচয় দেয়। অনুরূপ আর একটি গল্পে যেখানে তিন বন্ধু 'বৈষ্ণবী' সেজে তাদেরই একজনের শ্বশুরবাড়িতে রওনা হয়েছে, সেখানে প্রেমিক দারোয়ানের হাতে সমস্ত জিনিসটার রসভঙ্গ উচ্ছ্বসিত রঙ্গপরিণাম লাভ করে। 'বিবাহের বিজ্ঞাপনে' জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে বিবাহ-রসিক রাম অওতারের দুর্গতি সিচুয়েশন-বিন্যাসের আর একটি পরিপক্ক উদাহরণ।

'রসময়ীর রসিকতা'ও Fun-এর একটি অপূর্ব গল্প। কলহ-কন্দলা রণচণ্ডী স্ত্রী রসময়ী মৃত্যুর পরেও স্বামীকে যন্ত্রণা দেবার

সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। তাই প্রেতলোক থেকেও সে স্বামীকে পুনর্বিবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে ভীতি-প্রদর্শন করে চিঠি লেখে। এই চিঠিগুলির অদ্ভুত রহস্যময়তা সারা গল্পটিতে এক অলৌকিক পরিবেশ রচনা করে রেখেছে। পাঠকও এই গল্প পড়তে পড়তে হতবুদ্ধি হয়ে যান—তার অবিশ্বাসী মনেও প্রেতযোনিব অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি সংস্কার সৃষ্টি হতে থাকে। কাহিনীর শেষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে রহস্যের যবনিকা উঠে যায় অথচ রসময়ীব চরিত্র এবং তার 'Virago' ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ কবলে একে অস্বাভাবিক মনে হয় না। অপ্রত্যাশিত অথচ স্বাভাবিক এবং কৌতুকের সূত্রে নিবদ্ধ সংযত পবিমিতিবোধেই প্রভাতকুমারের Fun শিল্পগুণে মণ্ডিত হয়েছে।

'রসময়ীব রসিকতায়' থিয়োসফিস্ট সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ আছে। কিন্তু সে শ্লেষ জ্বালাহীন—ব্যক্তিকৌতুকের একটুখানি সামাজিক সম্প্রসারণ মাত্র। 'খোকার কাণ্ডে' হরসুন্দরবাবুব উগ্র ব্রাহ্মিকতাকেও কিছু আঘাত করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও ট্রেনের কামরার 'সিচুয়েশন'টি গল্পকে রঙ্গপরিণতিই দিয়েছে—তাকে ব্যঙ্গাত্মক কবে তোলে নি। 'অদ্বৈতবাদ' গল্পে আপাত দৃষ্টিতে পরম বৈষ্ণব-ভক্ত ব্যবসায়ীর যে শাঠ্যরূপ দেখানো হয়েছে—তাতেও রসিকতাই মুখ্য, আক্রমণ নয়। 'যুগল সাহিত্যিক'-এ এক শ্রেণীর কবিযশঃ-প্রার্থীকে নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করা চলত, কিন্তু সেখানেও বন্ধুর খ্যাতিতে

ঈর্ষাতুর নোবেল-প্রাইজ-লোভী কবির অপরূপ কবিতা সমস্ত গল্পটির মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে :

'কুর্চশেখর তুত্থাঞ্জন বিকীর্ণ চতুরঙ্গে
নর্তনপরা আয়তচ্ছদা অভ্রঙ্কষ ভঙ্গে।
ভোজনাকাঙ্ক্ষ যতেক ধ্বাঙ্গ ইল্বল ধরি ভুঞ্জে,
জিহ্মমোহন উল্লম্ফন করে বল্লজপুঞ্জে।'—

সমাজবিধির ওপরে বিশ্বাস, জীবনচর্চায় শান্ত সংযম, এবং সর্বোপরি আত্মতৃপ্ত মানসিকতা কখনোই শ্লেষ-সৃষ্টির আনুকূল্য করে না। যে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও সামাজিক অসঙ্গতি-বোধ থেকে সুইফ্‌টের স্যাটায়ার জন্ম নেয়, শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী'তে যে জ্বালা বুকফাটা বেদনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য'-এ ও 'কমলাকান্ত'-তে দেশপ্রেমিক আদর্শবাদী কবিচিত্ত যে আর্তশ্বাস ফেলে, সেই মানসিকতা প্রভাতকুমারে অনুপস্থিত। তাই তাঁর Satire তাঁর Wit এবং Fun-কে সামান্য প্রসারিত করেছে মাত্র, কখনো একটি জ্বালাজর্জর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয় নি। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না।

॥ ৩ ॥

প্রভাতকুমার বাঙালি সংসারের নিপুণ কলাবিদ। তাঁর স্নিগ্ধ মমত্বের স্পর্শে আমাদের পরিচিত পারিবারিক জীবনের

হাসিকান্নাগুলি মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজের ওপর প্রয়োজন-মতো ধিক্কার কখনো কখনো আছে—যথা, 'কুড়ানো মেয়ে'তে অর্থলোভী কৃপণ সীতারামের চরিত্র। কিন্তু ধিক্কার বা আঘাত তাঁর গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে নি। হয় হাস্যরস তাদের আলোকিত করে দিয়েছে, নইলে করুণার স্পর্শে তা মেদুর হয়ে গেছে।

প্রভাতকুমারের সাহিত্য পড়তে গিয়ে পাঠকের চার্লস্ ডিকেন্সকে মনে পড়তে পারে। ডিকেন্সেব ব্যাপ্তি হয়তো প্রভাতকুমারে নেই—কিন্তু জীবনবোধে দুজনের অনেকখানি একধর্মিতা আছে। সহজ কৌতুক ডিকেন্সের রচনারও মধুস্বাদী বৈশিষ্ট্য; আর এই কৌতুকের অন্তরালে মমতার অশ্রুবিন্দু লিককের ভাষায় "Mingled heritage of tears and laughter that is our lot on earth"—মনে পড়িয়ে দেয়। প্রভাতকুমারের কৌতুকবসেরও একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য এইখানেই। 'কুড়ানো মেয়ে'তে তার সন্ধান মেলে—'সম্পাদকের কন্যাদায়'-এ হাসির নেপথ্যে এই অশ্রুকে ভোলবার নয়। 'যুগল সাহিত্যিকের' পটভূমিতেও এ বেদনা উপস্থিত। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের কছে থেকে 'দেবী' গল্পের প্লট পেয়েছিলেন—আর "পুনশ্চেব" 'খ্যাতি' কবিতাটি যে প্রভাতকুমারের 'যুগল সাহিত্যিক'-এর পরোক্ষ-প্রভাবিত নয়, এ কথাও জোর করে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বেদনাই মুখ্য—'যুগল-সাহিত্যিক'-এ হাসির সঙ্গে ব্যথার মিলন সাধিত হয়েছে।

"এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাবো কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো
আমার লেখার দগ্ধ শেষ।
আজ বাদে কাল হোতো ধুলো
আজ হোক ছাই—"

'খ্যাতির' এই ফলশ্রুতি 'যুগল সাহিত্যিকে'ও আছে।

'বাজীকব' গল্পটিও প্রসঙ্গত বিশেষভাবে স্মরণীয়। লেখকের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি এই গল্পটি। 'জীবন্ত মানুষ ভক্ষণের' চমকপ্রদ চাতুর্য গল্পটিকে পরম কৌতুকাবহ পরিণতি দিয়েছে—কিন্তু এর অন্তস্তলচারী বেদনাটি পাঠককে সর্বদাই ভারাক্রান্ত রাখে। দুর্গত, প্রৌঢ় ম্যাজিশিয়ান অভাব, দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কোন স্তরে নেমে এই প্রবঞ্চকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—সেটি স্মরণ করলে উচ্চস্তরের কৌতুকের যথার্থ সার্থকতা এই গল্পে অর্জিত হয়েছে একথা বলা যায়।

"Humour is blended with pathos till the two are one"—কৌতুকশিল্পের এই মর্মবাণীটি প্রভাতকুমার 'বাজীকর' গল্পে সম্পূর্ণভাবেই তুলে ধরেছেন। ডিকেন্সের কৌতুক এই জাতের—এই অশ্রুনিহিত হাসির পরিবেষণেই চার্লি চ্যাপলিনের মাহাত্ম্য।

করুণরসাত্মক গল্পগুলির মধ্যে 'কাশীবাসিনী' ও 'আদরিনী' সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গল্পটিতে যৌবনের ভ্রান্তিতে

পদস্খলিত জননীর যে মর্মবেদনা ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসের ছবি প্রভাতকুমার এঁকেছেন তা তাঁর গভীর ও নিবিড় সমবেদনার দ্যোতক। পতিতা নারীর অন্তর-বেদনার মধ্যে যে সৌন্দর্য মাধুর্য ও পবিত্রতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচারক' গল্পের ক্ষীরোদার চরিত্রের সাহায্যে প্রথম বাংলা সাহিত্যে তার সংবাদ এনে দিয়েছিলেন। প্রভাতকুমার এই গল্পে সে-কথা শুনিয়েছেন। মিতভাষিতা 'কাশীবাসিনী' গল্পের আর একটি বিশিষ্ট গুণ। গল্পটি সম্বন্ধে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'কাশীবাসিনী'তে শরৎ-সাহিত্যের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।[১]

করুণ রসের দিক থেকে 'আদরিনী' প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প। মোক্তার জয়রাম মুখুজ্জে জেদের বশে যে হাতিটি কিনেছিলেন– সে যেন তারই প্রতীক। জয়রামের সৌভাগ্যের সঙ্গে-সঙ্গে সে উদ্ধত মহিমা নিয়ে পরিক্রমা করেছে, দুর্ভাগ্যের দিনে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জয়রামের ওপরেও মৃত্যু নেমে এসেছে। যেন 'আদরিনী'র মধ্যেই জয়রামের প্রাণ-ভ্রমর প্রচ্ছন্ন ছিল। গল্পটি আমাদের শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে পার্থক্যও আছে এবং সে-পার্থক্য উভয়ের শিল্পিসত্তার পার্থক্য। 'মহেশ' সারা বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষকসমাজের প্রতিনিধিরূপে দেখা দিয়েছে—তার তাৎপর্য ব্যাপকতর। 'আদরিনী' গল্পের মধ্যেই যেন এই দুজন শিল্পীর মনোধর্ম অভিব্যক্ত হয়েছে।

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা, ২৩ পৃষ্ঠা

'আদরিনী' পারিবারিক নাম—একটি সস্নেহ কোমলতা যেন নামটির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রয়েছে। আর 'মহেশ' নাম যেন জনগণের প্রতীক ধূসর-রুক্ষ-পিঙ্গলজটাজাল বাংলার শ্মশান-প্রান্তচারী শঙ্করকে মনে করিয়ে দেয়—যিনি মানুষের সমস্ত দুঃখ-বেদনা-গ্লানি পত্রপুটে পান করে নীলকণ্ঠ। অনাবৃষ্টি-দগ্ধ বৈশাখী প্রান্তরের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র যেন দুঃখ-দেবতা শঙ্করের সাধনার আসনটিই রচনা করে দিয়েছেন। 'আদরিনী'তে 'মহেশে'র এই ব্যাপ্তি না থাকলেও গৃহপালিত পশুর প্রতি মমতার রসসেচনে এবং জয়রামের একান্ত দুঃখাত্মক পরিণামে আমাদের মনকে লেখক ভারাক্রান্ত করে তোলেন।

'দেবী' সর্বাঙ্গীণ ভাবেই প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, এই গল্পের পরিকল্পনা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই স্বীকারোক্তি নিরর্থক নয়। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, এর কল্পনায় এমন একটা তির্যক বৈচিত্র্য আছে যাকে প্রভাতকুমারের সরল সরসতার সগোত্র বলা যায় না। প্রভাতকুমার সহজ পথের যাত্রী —তাঁর কল্পনা বস্তুনির্ভর। কিন্তু এই গল্পটির সমস্যা কবিমননজাত এমন একটি ঊর্ধ্বগামী কল্পনাকে আশ্রয় করেছে—যা থেকে 'মহামায়া'জাতীয় গল্পের উদ্ভব সম্ভব। শ্বশুর কালীকিঙ্কর স্বপ্নাদেশ পেলেন যে স্বয়ং জগজ্জননী কালী তাঁর পুত্রবধূরূপে অবতীর্ণা এবং ফলে এক মুহূর্তে মানবী দয়াময়ী দেবীত্বের পর্যায়ে উন্নীত হল। কাহিনীর প্রথম দিকে দয়াময়ীর মানবীরূপে

বাঁচবার চেষ্টা যে করুণ রসের সূচনা করে দিয়েছিল, তা ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হল—যখন দয়াময়ী ঘটনাচক্রে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে সে সত্যি-সত্যিই দেবী। শেষ অধ্যায়ে দেবীর আত্মহত্যায় কাহিনীর যবনিকা-পতন ঘটল।

যে-কোনো মহৎ ছোট গল্পের মতো শুধু দশচক্রে মোহগ্রস্ত একটি নারীর ভয়াবহ পরিসমাপ্তিই এই গল্পের চরম ফলশ্রুতি নয়। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনাব একটি প্রধান তত্ত্ব নিহিত আছে। অন্ধ ধর্ম-সংস্কারের বেদীমূলে জীবনের করুণ অপচয় রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সহ্য করতে পারেন নি—'ধর্মের সঙ্গে ধর্মতন্ত্রের' বিরোধে তিনি বার বার প্রাণের বন্দনা শুনিয়েছেন। 'দেবী'তে সেই প্রাণ ও প্রেমের পরাভব এমন গভীর ও পরিব্যাপ্ত ট্রাজেডির বার্তা এনে দিয়েছে- যা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পেই সম্ভব। গল্পের মূল আখ্যানাংশ রবীন্দ্রনাথের হোক বা না-ই হোক—এখানে প্রভাতকুমারের শিল্প-প্রতিভা নিজেব শান্ত, সরস ও সজল কল্পনাব সীমা অতিক্রম করে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকতা-সুলভ এক মহাকাশের মধ্যে নিক্রান্ত হয়েছে। আর গল্পটির সর্বতোমুখী শৈল্পিক সফলতা এই সত্যটিই প্রমাণ করেছে যে আর একটু আত্মস্থ এবং সাধননিষ্ঠ হলে তাঁর যে হাত জলতরঙ্গ বাজিয়েছে, তা মৃদঙ্গে ধ্রুবপদী বোল তুলতে পারত।

ইয়োরোপের পটভূমিতে প্রভাতকুমার যে-সব গল্প লিখেছেন—তাদের মধ্যেও তাঁর বৈশিষ্ট্যটি অব্যাহত আছে।

একমাত্র ঘটনাস্থলের পার্থক্য ছাড়া তাব অধিকাংশ গল্পই যেন বাংলা দেশের পারিবারিক ও হৃদয়ক্ষেত্রের কাহিনী। মনে হয়, প্রভাতকুমার যেন বাঙালি চরিত্রগুলিকেই ইংরেজের ছদ্মবেশ পবিয়ে দিয়েছেন। তাঁব 'ফুলেব মূল্য' বা 'মাতৃহীন' একান্তভাবে বাঙালি মনোভাবকেই পরিবহন করেছে। স্বভাবতই রক্ষণশীল, পারিবারিক ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা-বিরোধী এবং সংস্কারগ্রস্ত ইংবেজ-গৃহে প্রভাতকুমার তাঁব স্বদেশবাসীর চরিত্র-ধর্ম অনেকখানি খুঁজে পেয়েছিলেন। হৃদয়-নির্ভর শিল্পী প্রভাতকুমার তাই ইংরেজেব অন্তরেব ছোটখাটো দুঃখ-বেদনাকে সহজেই আত্মস্থ করে নিতে পেরেছেন। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানচর্চায় যে-ইংরেজ সেকালে বিশ্বজয় করেছিল, তার চরিত্রেব সেই বৈদ্যুতী ছটা প্রভাতকুমারের গল্পে ধরা পড়ে নি। তা সম্ভবও ছিল না—কারণ প্রভাতকুমারের সাহিত্যে বুদ্ধিবাদের স্থান গৌণ—তিনি একান্তভাবেই আবেগজীবী শিল্পী। ইয়োরোপ সম্পর্কে যে-গল্প তিনি লিখতে পারেন নি—পরে তা লিখবাব দায়িত্ব নিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

সুপ্রচুর ও সহজ সরস গল্প লিখে প্রভাতকুমার বাঙালির অন্তরে যে আসন রচনা করে নিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী কোনো লেখক এখনও তা পান নি। পাওয়ার পথে সম্ভবত বাধাও আছে। এ যুগে রবীন্দ্রচর্চা ব্যাপক হয়েছে—তাঁর কল্পনার বিশালতা ও কাব্য-সৌন্দর্যের সঙ্গে পাঠক অনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে আসছে। তবুও গল্প-লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের

জনপ্রিয়তা এখনো সীমাবদ্ধ। পরবর্তী লেখকেরা—যাঁরা পাঠকের কাছে নগ্ন জিজ্ঞাসা ও উগ্র ব্যক্তিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন—তাঁদের শক্তি হয়তো শ্রদ্ধা পায়, কিন্তু সংস্কার-ভাঙা স্পষ্টতা এবং সমস্যার তিক্ততা সাধারণ মানুষের প্রীতি উৎপাদন করে না। তাঁরা পুজো পান—কিন্তু তাঁদের প্রতি স্বতোৎসারিত প্রেম সহজে উচ্ছ্বসিত হয় না। এই প্রীতি লাভ করতে গেলে শান্ত, স্থির, স্নেহকোমল, কিছুটা সংরক্ষণশীল এবং সহজ-প্রিয়ংবদ হতে হয়—আর এই সব গুণে মণ্ডিত হয়েই প্রভাতকুমার তাঁর সফলতা লাভ করেছেন। বর্তমান যুগের কোনো গল্প-লেখকই সে-সফলতা পাবেন না—তার পেতে হলে তাঁকে কালাতিক্রমণের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হবে।

তৃতীয় প্রসঙ্গ

“শরতের মেঘে বজ্র”

[পরশুরাম]

॥ ১ ॥

‘আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম’—ইংল্যাণ্ড-বিজয়ী রোমান সেনাপতির মতো এ-কথা বলবার অধিকার ‘পরশুরাম’ ছদ্মনামধারী রাজশেখর বসুরও আছে। বিজ্ঞানীর কর্মশালা থেকে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব, অদ্ভুত তাঁর শৈলী এবং পর্যবেক্ষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হৃদয়রাজ্যে তাঁর দিগ্বিজয়ী পদক্ষেপণ। পরশুরামের প্রথম বই ‘গড্ডলিকা’ পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে জানালেন : “সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল।…বইখানি চরিত্রচিত্রশালা।…তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।”

এই জানা মানুষের চেনা মূর্তিরই এদিকে ওদিকে একটু রঙের ছোঁয়া দিয়ে, একটুখানি বাঁকা চোখ দিয়ে দেখে, প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই যে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি, eccentricity ও কৌতুকের উপকরণ আছে সেগুলোকে সামান্য বাড়িয়ে পরশুরাম তাঁর অপরূপ সাহিত্য-সম্ভারের অর্ঘ্য সাজিয়ে দিলেন। ব্যঙ্গচিত্রী (Cartoonist) যেমন সহজ স্বাভাবিক মানুষের ভেতরে তাঁর একটুখানি স্বাতন্ত্র্যকে বাছাই করে তাকেই তার

প্রতীক করে তোলেন, অর্থাৎ তাঁর হাতে যেমন উন্নত-নাসা মানুষ নাকসর্বস্ব হয়ে ওঠে, গুম্ফধারীর গুম্ফটিকেই যেমন তার কায়িক প্রতিনিধিরূপে তিনি নির্বাচন করেন; চার্চিলের চুরুট, চেম্বারলেনের ছাতা, স্টালিনের পাইপ অথবা গ্ল্যাড্‌স্টোনের ব্যাগ যেমন তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু; তেমনি চেনা মানুষের নক্‌শা যিনি আঁকেন, তাঁকেও এই ধরনের কিছু ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বেছে নিতে হয়। কার্টুনিস্টের নামে যেমন কেউ মানহানির মামলা করেন না—বরং রসিকের মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁকে আস্বাদন করেন, দ্বিতীয়-যুদ্ধপূর্ব পরশুরামের নক্‌শাগুলি তেমনি তাঁর 'মডেল'দের কাছেও পরম উপভোগ্য বলেই মনে হত। দ্বিতীয়-যুদ্ধপূর্ব কথাটি এই জন্যই বলেছি যে পরবর্তীকালের তাঁর অধিকাংশ গল্পেই একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য।

পরশুরামের গল্পের বইয়ের সংখ্যা মোট সাত—গল্পের সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি। পরিমাণে খুব কম নয়। এদের মধ্যে 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়েছে—'হনুমানের স্বপ্ন' আত্মপ্রকাশ করেছে খানিকটা ব্যবধান নিয়ে। তারপরে বেশ কিছুদিন গল্পলেখক হিসেবে যেন পরশুরামকে অনেকখানি নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। তিনি তখন গভীর ও গম্ভীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত—মনে হয়, গল্প লেখার পালা তাঁর ফুরিয়ে গেছে। এই সময় তিনি বাল্মীকি-রামায়ণ ও ব্যাসকৃত মহাভারতের সারানুবাদে ব্যাপৃত।

১৩৩৯ সালে তাঁর 'প্রেমচক্র' লেখা হওয়ার পর পুরো দশ বছর আর কোনো গল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা পাই না। মনে হয়েছিল পরশুরামের কুঠার বুঝি অস্ত্রশালায় গিয়ে চির-বিশ্রাম লাভ করেছে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে আবার সজাগ হয়ে উঠতে দেখা গেল দশ বছর পরে—অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই সংকট-লগ্নে—যখন তার অন্ধকার ছায়া বর্মা-মণিপুরের পথ দিয়ে বাংলা দেশের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাইরের বীভৎস রক্তপাতের নেপথ্যে ক্লেদাক্ত লোভ, চোরাবাজারী মুনাফা-শিকারের জটিল রন্ধ্রপথে দেশব্যাপী মন্বন্তরকে ঘনিয়ে এনেছে।

এই সময় পরশুরাম লিখলেন 'দশকরণের বানপ্রস্থ।' বানপ্রস্থ নিয়েও দশকরণ যেমন মুক্তি পেলেন না—তাঁকে আবার বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে হাজার বন্ধনে বাঁধা পড়তে হল, তেমনি রামায়ণ-মহাভারতের প্রব্রজ্যা থেকে পরশুরামকে আবার জীবনের ডাকে সাড়া দিতে হল। সামসময়িক কাল রূপক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল তাঁর 'তৃতীয় দ্যূতসভায়'—রাজনীতির কূটতাকে তীব্র শ্লেষের আঘাত হানলেন তিনি। দশ বছর পরে দশকরণের নব পর্যায় আরম্ভ হল।

সমাজের ও জীবনের মধ্যে একটা তীব্র অস্বস্তি, অনিশ্চয়তা, ক্রোধ ও অশ্রুর সমাবেশে ছোটগল্পের প্রাচুর্যের বীজ ছড়িয়ে পড়ে—তার জলসেচন ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা সর্বত্রই তার উদাহরণ পাই। বাংলা সাহিত্যেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছোট

গল্পের অন্যতম স্বর্ণযুগ। চারদিকে তখন মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি ফেটে পড়ছে—সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে, পুঞ্জীভূত গ্লানিতে জাতি তখন পঙ্কস্নান করছে, মানুষের লোভের যড়্যন্ত্রে গড়া দুর্ভিক্ষে সমস্ত বাংলা দেশ নরকে পরিণত হয়েছে আর কালোবাজারীরা মুণ্ডশিকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ওদিকে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা, আগস্ট বিপ্লব দমন করবার জন্যে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা—আর দেশের সম্মান-সম্ভ্রমকে ট্যাঙ্ক-জীপ-লরীর তলায় দলিত করে বিদেশী ফৌজের তাণ্ডব—ভিতরে বাইরে এই অসহ্য যন্ত্রণার চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠে সেদিন বাঙালি লেখকেরা কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনার বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন। পরশুরামও তখন যুগের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। সেই থেকে আজও তাঁর গল্প লেখার কাজ মোটের ওপর নিয়মবদ্ধভাবে চলছে।

কিন্তু এই যুদ্ধ, পৃথিবীব্যাপী মানুষের এই স্বার্থপরতার সংকট অভিব্যক্তি পরশুরামের মনোভঙ্গিতে মস্ত বড় একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাঁর কৌতুক উত্তিক্ত শ্লেষে পরিণত হয়েছে—তাঁর হাসির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে গভীর মর্মযন্ত্রণা। আমরা তার কথা যথাসময়ে আলোচনা করব।

॥ ২ ॥

পরশুরামের প্রথম যুগের যে-গল্পগুলি বাংলা-সাহিত্যে তাঁকে খ্যাতির আসনে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে, তাদের প্রথম তিনটি গল্প-সংগ্রহেই পাওয়া যাবে। 'দশকরণের বানপ্রস্থ' এবং 'তৃতীয় দ্যূতসভা' "হনুমানের স্বপ্নে" সন্নিবিষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু ওরা অনেক পরের লেখা, ওদের চরিত্রধর্ম আলাদা।

বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা (Realism) রবীন্দ্রনাথের কলমে দেখা দিয়েছিল অনেকদিন আগেই। 'চোখের বালি'তে তার প্রথম প্রথম উদ্ভাস, 'ঘরে বাইরে'তে পূর্ণবিকশিত রূপ। 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাবে এই বস্তুতন্ত্রতা একটা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু মোটের ওপর এই বস্তুতন্ত্রতা, বিচারবুদ্ধিনির্ভর "Rational ·phisolophy" এবং "more methodical character to the current conception of truth"—আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক-নির্ণয়ের দিকেই সম্প্রসারিত হয়েছিল। "ঘরে বাইরে"তে তা বিস্তৃতভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক সত্যের "uncoventional" উদ্ঘাটন—সংস্কার ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব—ব্যাপকতর ক্ষেত্রের জন্যে প্রতীক্ষায় ছিল। পারিবারিক জীবনের পটভূমিতে বস্তুতন্ত্রতা প্রবাহিত হল অন্তর্মুখী আত্মনিরীক্ষামূলক উপন্যাসের মাধ্যমে—সমাজের চিরচলিত সংস্কারগুলির প্রসঙ্গও

স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে এসে পড়ল। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকের দায়িত্ব কেবল ওইখানেই শেষ নয়। স্থুলভ রোম্যান্টিসিজম, ভাবপ্রবণতা, অহংবোধ, ধর্মের মিথ্যাচার, বর্ণচোরা লোভ, স্বার্থপরতা, ভণ্ড মানবপ্রেম (False philanthropy) ও ছদ্ম দেশাত্মবোধ—এগুলির স্বরূপ নির্ণয়ও তাঁর কাজ।

পারিবারিক সম্বন্ধের বহির্ভূত এবং বিচিত্রমুখী কুসংস্কার ও অন্যায় স্বাভাবিক ভাবেই শ্লেষ ও কৌতুকের আওতায় এসে পড়ে। স্যামুয়েল্ বাট্‌লার এ-কাজ করেছিলেন তাঁর "The Way of All Flesh"-এ, বোল্‌তেরের তীক্ষ্ণ তিক্ত সাহিত্য এর নিদর্শন, থ্যাকারের "Vanity Fair" বা "The Book of Snobs"--বস্তুতান্ত্রিকের এই "logical" সমাজ বিশ্লেষণ। বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাবও এই বস্তুতান্ত্রিকতা থেকেই। তাঁর মনোভঙ্গিও গঠিত হয়েছে বস্তুতন্ত্রসুলভ বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা – তাঁরও উদ্দেশ্য অহং, ভাববিলাস, মিথ্যাচারী ধর্ম ও সর্বাঙ্গীণ ভণ্ডামিকে আক্রমণ করা। এদিক থেকে তিনি থ্যাকারের সমানধর্মা।

কিন্তু মানসিক-প্রবণতার মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও থ্যাকারের সঙ্গে পরশুরামের তুলনা চলে না। থ্যাকারের কৃতিত্ব উপন্যাসে –গল্প জমানোর আর্ট তাঁর মুষ্টিগত। থ্যাকারের রচনায় আক্রমণ নগ্ন ও নির্মম, পরশুরামের আক্রমণ 'সুগার কোটেড্ কুইনিনের' মতো কোমল-কৌতুকের নেপথ্যে নিহিত। "Vanity Fair"-এর Becky Sharp-এর মতো নারীবৃন্দ

থ্যাকারের প্রধান লক্ষ্য, পরশুরামের রচনায় 'জিগীষা দেবী'-র মতো সামান্য দু-একটি নমুনা থাকলেও নারী সম্পর্কে তাঁর একটি শিভাল্‌রিস্থলভ সম্ভ্রম আছে।

তা ছাড়া থ্যাকারের রচনায় জার্নালিস্টের বৈশিষ্ট্য—পরশুরামের গল্পে বাঙালির বৈঠকের আমেজ। এদিক থেকে তিনি ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসাধক। তাঁর কেদার চাটুজ্জে ত্রৈলোক্যনাথের "তিনু" ও "ডমরুধরের" সংযত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

পরশুরামের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিখ্যাত কৌতুক-শিল্পী মার্কিনী লেখক অধ্যাপক স্টিফেন লিককের সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে আছে। সংযমস্নিগ্ধ রসিকতা, বিদ্যা এবং বুদ্ধিদীপ্ত 'wit' দুজনেরই রচনার মুখ্য বিশেষত্ব। লিকক প্রধানত "নক্‌শা" এঁকেছেন—পরশুরামও তাই করেছেন। তবু পার্থক্যও অনেক। সমাজ ও জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতির উন্মোচন থাকলেও বৈঠকী মেজাজের রসোল্লাস অকৃত্রিম বাঙালিত্বের এমন একটি আতিশয্য পরশুরামের মধ্যে এনে দিয়েছে—যার সন্ধান লিককে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর নিপুণতা লিককে অনুপস্থিত—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি সত্যিই "মূর্তির পর মূর্তি রচনা করিয়াছেন"।

পরশুরাম বাংলা-সাহিত্যে 'রিয়্যালিজ্‌ম্‌'-আন্দোলনেরই অন্যতম তির্যক শিল্পী। তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডেই' বস্তুতান্ত্রিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাঙালির

"লিমিটেড্" কোম্পানির অন্তরালবর্তী সমস্ত মিথ্যাচার ও ভণ্ডামিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।* বাংলা দেশের "যৌথ ব্যবসার"র মধ্যে যে জাল-জুয়াচুরির আধিক্য আমাদের জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করে রেখেছে—এই গল্প তার একটি সার্থক ব্যঙ্গাত্মক নিদর্শন। কিন্তু সমস্ত রচনাটির ওপর যে আতিশয্য বিস্তার করা হয়েছে, যে কার্টুনিস্টসুলভ কৌশল রচনা করা হয়েছে—তার দ্বারা এর তীব্রতম শ্লেষও কৌতুকের নির্মলতায় স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে"র প্রস্‌পেক্‌টাস্ থেকে তার নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

"যাত্রীদের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। ৺সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে, এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির নিহত ছাগ-

*গল্পটির প্রেরণারূপে "ডমরু চরিতের" পঞ্চম গল্পে প্রথম পরিচ্ছেদের 'স্বদেশী কোম্পানী' স্মরণীয়। এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ তৈরির কল্পনা—শেয়ার বিক্রি এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে ঠকিয়ে টাকা আত্মসাৎ—'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' তারই বিস্তৃত রূপায়ণ। ত্রৈলোক্যনাথের শিষ্য-রূপেই যে পরশুরামের বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব এই গল্পই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

সমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।”

প্রস্‌পেকটাস্‌টির সমস্ত ব্যবসায়িক গম্ভীরতা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে আতিশয্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যে উৎকট পরিকল্পনার সন্ধান মেলে এবং একটু পরেই কুমড়োর খোসা ‘কস্টিক দিয়ে বয়েল করে’ ‘ভেজিটেব্‌ল শু’ তৈরী করবার যে গম্ভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা শোনা যায়--তা শ্লেষের সমস্ত জ্বালাকে স্তিমিত করে দেয়। ঝানু ব্যবসায়ী গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া এই আতিশয্যদীপ্ত কৌতুকেই পুণ্যের কমিশন সংগ্রহ করে :

“অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রূপেয়া হর্ জগেমে খরচ কিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রূপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্ (পুণ্য) ষোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।”

পুণ্যের এই ‘কমিশন’ কৌতুকের দিক থেকে অতুলনীয় সৃষ্টি। গণ্ডেরিরামের সমস্ত শঠতা ভুলে গিয়ে আমরা তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি—এমন একটি ভয়ঙ্কর ধড়িবাজ লোকও লেখকের কৌতুককুশলতায় আমাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

জোচ্চুরি, ভণ্ডামি, সমাজবিরোধিতা ও ভাববিলাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে পরশুরামের কৌতুকের আক্রমণ উচ্ছলিত হয়েছে 'বিরিঞ্চি বাবা'য়, 'মহাবিদ্যায়', 'কচিসংসদে', 'উলটপুরাণে' ও অংশত 'চিকিৎসা সঙ্কটে'। 'বিরিঞ্চিবাবা'য় ভণ্ড সাধুর যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, তার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা যে এখনো যথেষ্ট কার্যকরী হয় নি—দেশব্যাপী তথাকথিত মহাপুরুষদের শিষ্য-শিষ্যাদের তালিকা অনুধাবন করলেই তার প্রমাণ মিলবে। 'কচিসংসদে' তৎকালীন তারুণ্যের পাগলামিকে দু-দিকে আক্রমণ করা হয়েছে—তার একপ্রান্তে লালিমা পাল (পুং) আর একপ্রান্তে কেষ্টব হাইকোর্টশিপ। 'মহাবিদ্যায়' অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে চৌর্যবিদ্যার মহিমা কীর্তন করেছেন লেখক—"অপহার বর্মা"রাই যে এ-কালের যুগনায়ক সেই তত্ত্বটিই সরস-ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন তিনি এবং সেই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 'টাইপ'-চরিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

'উলট-পুরাণ' অসাধারণ সৃষ্টি। রচনাটি রূপক এবং স্পষ্টতই শ্লেষধর্মী। ভাবতীয় অধিকৃত ইয়োরোপের যে উদ্ভট চিত্র এতে ফোটানো হয়েছে—বস্তুত তা ভারতবর্ষেরই রাজনৈতিক রূপ। উল্‌টো দিক থেকে সমস্ত জিনিসটা দেখানোব দরুন এর তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর শ্লেষ পরম উপাদেয় কৌতুকে পরিণত হয়েছে। খাঁ সাহেব গবসন টোডির মধ্যে আমাদের খাঁ সাহেব রায় সাহেবদের চিনতে কষ্ট হয় না, স্যার টিকসি টার্নকোটেরা স্বার্থশিকারী এক

ধরনের রাজনৈতিক নেতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, ভোমস্টাট প্রাসাদের প্রিন্স ভোম নেশাখোর অপদার্থ দেশীয় সামন্ত রাজাদের নির্ভুল চিত্রণ। কল্পনার বৈচিত্র্যে এর জ্বালা আমাদের স্পর্শও করে না—বাথরুমে গবসন টোডির আত্মভক্ষণের বিবরণ, ফ্লফির 'পাঁচ'কে 'ফ্যাঁচ্' বলে উচ্চারণ করা বা ট্রিক্সির অপূর্ব বক্তৃতা কৌতুকের অট্টহাসিকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। নাবীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত লণ্ডনের পুরুষ নাগরিকদের মর্মবেদনা সংবাদ-পত্রের 'সম্পাদকীয়' স্তম্ভে এই ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে ঃ

"সবকাবের পেয়ারের উড়িয়া পুলিস তখন কি করিতেছিল ? তারা একগাল পান মুখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারী গুণ্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল- 'হী—হ-হ-হ-হ।' খাঁ সাহেব গবসন টোডি, সার ট্রিক্সি টার্নকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গা নিবাবণেব উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জেন্টরা তাঁদের অপমান করিয়া বলিয়াছে, 'এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব তো ডণ্ডা খিব।'"

বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে উদ্ধৃতিটির তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই। প্রচণ্ডতম শ্লেষকে এমন উপাদেয় উপভোগ্যতায় রূপান্তরিত করবার জন্যে যে কতখানি মানসিক ঔদার্য ও চিত্তপ্রসন্নতা প্রযোজ্য তা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র 'উলট-পুরাণ' পরশুবামকে অমর করতে পারত।

বস্তুতন্ত্রসমুদ্ভব এই সমাজনিরীক্ষা ছাড়াও পরশুরামের গল্পের আর একটি ধারা আছে—সেটি ত্রৈলোক্যনাথের অনুসরণে।

তার নিদর্শন ‘লম্বকর্ণ’, ‘স্বয়ম্বরা’, ‘দক্ষিণ রায়’, ‘মহেশের মহাযাত্রা।’ এসব গল্পে বৈঠকী আমেজটিই মুখ্য—যদিও কিছু কিছু নিরীহ আক্রমণ এদের মধ্যেও আছে –যথা ‘দক্ষিণ রায়ের’ বকুবাবুব ইলেক্‌শেন ট্র্যাজেডী। বিশুদ্ধ আনন্দ-পরিবেশনের প্রেরণা থেকেই এই গল্পগুলি উৎসারিত।

প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার ভিত্তিতে পরশুরামের কয়েকটি গল্পও উল্লেখযোগ্য, যথা ‘জাবালি’, ‘হনুমানেব স্বপ্ন’, ‘পুনর্মিলন’ ও ‘প্রেমচক্র’। এদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গল্প ‘জাবালি’। ‘উলট পুরাণের’ মতোই ‘জাবালি’ও পরশুরামের অবিস্মরণীয় কীর্তি। স্টাইলের দিক থেকে ‘জাবালি’ সম্ভবত পরশুরামের শ্রেষ্ঠ রচনা। বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের এমন সাযুজ্য বাংলা গল্প-সাহিত্যে আব নেই। লোকায়তিক দর্শনের নির্ভয় ধ্বজাধারী শালপ্রাংশু পুরুষ জাবালিব চরিত্রেব মধ্য দিয়ে পরশুরাম একটি সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ বুদ্ধির অসামান্য দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন। পরিণামে গল্পটির সমস্ত ব্যঙ্গ এবং কৌতুক সংস্কারবিহীন মুক্ত প্রজ্ঞার মহিমাকীর্তনে গম্ভীরমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এই গল্পে পরশুরাম যেন রিয়্যালিস্ট যুগের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিত্বকেই উপস্থিত করেছেন –জাবালি বস্তুতান্ত্রিক কালের নির্মোহ, সত্যসন্ধ ও নির্ভীক ভাববিগ্রহ।

‘ভুশণ্ডীর মাঠে’ বৈঠকী আঙ্গিকে রচিত এবং ত্রৈলোক্যনাথের পদ্ধতিতে রঙ্গ ও রূপকের একটি উপাদেয় উদাহরণ। গল্পটির মূল বক্তব্য নিহিত এর শেষ অধ্যায়ে, যেখানে শিবুর তিন জন্মের তিন

স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী উপস্থিত হয়ে এক উৎকট ভৌতিক দাম্পত্য সমস্যার ত্র্যহস্পর্শ রচনা করেছে। গল্পের শেষে লেখক মন্তব্য করছেন: "রাম রাম রাম। জয় হাড়ি ঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা। কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করিবে? আমার কর্ম্ম নয়।...অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাট্‌জ্যে, চারু বাড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনোরকম নীতিবিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে।"

লেখকের আসল উদ্দেশ্য এই মন্তব্যটির মধ্যেই সুপ্রকট। আমাদের দেশের পাঠকমাত্রেরই স্মরণ থাকবার কথা যে বাংলা সাহিত্যে নীতি ও শ্লীলতার মানদণ্ড নির্ধারণ নিয়ে এক সময়ে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং গল্পকারের উদ্দিষ্ট চারটি ব্যক্তিত্বই ছিলেন সে আলোড়নের প্রধানতম নায়ক। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন একদিকে বস্তুতন্ত্রতার ওপর জোর দিয়ে তথাকথিত নীতি ও শালীনতাবোধের ছুঁৎমার্গকে আক্রমণ করেছিলেন, অপরদিকে 'ধ্রুবতারা'-খ্যাত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রমুখ সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।* এই দুই দলের বিরোধকে একটি অপরূপ

* এই আন্দোলনের জের রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ (১৩৩৪) অবলম্বনেও বেশ কিছুদিন চলেছিল এবং শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী প্রমুখ তাতে যোগদান করেছিলেন।

দাম্পত্য-সমস্যার মাধ্যমে গল্পটিতে কৌতুকচ্ছলে আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও পরশুরামের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত। ভৌতিক চরিত্রসৃষ্টিতে, বিশেষ করে যক্ষ নাড়ু মল্লিকের চিত্রণে তিনি যে রসের উল্লাস-উৎস মুক্ত করে দিয়েছেন, তার প্রবাহে গল্পের ব্যঙ্গের দিকটি একেবারেই গৌণ হয়ে গেছে।

পৌরাণিক পটভূমিতে রচিত 'প্রেমচক্র'ও এই জাতীয়। তবে তার স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। তা ছাড়া 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে পরশুরাম সাহিত্যরথদের ওপরেই ববাত দিয়েছেন, কিন্তু 'প্রেমচক্রে' গৃহিণীর বিভীষিকা সত্ত্বেও মোটের ওপর একটা সমাধান তিনি গল্পে দিতে পেরেছেন।

"গড্ডলিকা", "কজ্জলী" এবং "হনুমানের স্বপ্নই" পরশুবামের গল্প-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। তারপরেই 'দশকরণের বানপ্রস্থ' এবং 'তৃতীয় দ্যূতসভা' দিয়ে তাঁব দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ঘুমন্ত অগ্নিগিরির নব জাগরণই নয়—একদিক থেকে নবরূপও বটে। এই অধ্যায়ে পরশুরামেব সমাজ-সমালোচনা এক নতুন ধারায় গতিলাভ কবেছে।

॥ ৩ ॥

'দশকরণেব বানপ্রস্থের' কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামাধ্বনির মধ্যে "রামায়ণ-মহাভারতের" বানপ্রস্থ থেকে তিনি জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন। সেই

পুনরাগমনের সংবাদ পাওয়া গেল 'সমাগতো রাজবদুদ্ধতত্ত্যতির্ঘনাগমঃ'—'তৃতীয় দ্যূতসভায়'—"বিশ্বভারতী পত্রিকা"র মাধ্যমে।

বিংশ শতকীয় রাজনীতিই এই গল্পের আলোচ্য এবং সরলতা, সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠা যে এ-যুগে একান্তভাবে নির্বোধেরই উপজীব্য—গল্পের দৃঢ়পিনদ্ধ সুতীক্ষ্ণ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বটিই উপস্থিত করা হয়েছে। এই 'তৃতীয় দ্যূতসভা' থেকেই পরশুরামের কৌতুকমুখ্যতা শ্লেষের দিকে অগ্রসর হয়েছে—প্রশান্ত প্রসন্ন ললাটে ক্ষোভ ও জ্বালার মেঘচ্ছায়া প্রসারিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক গ্লানি ও হিংস্রতা পরশুরামকে কী পরিমাণে বিচলিত করেছিল, তার নিদর্শন 'গামানুষ জাতির কথা।' এই গল্পে একটি ফিউচারিস্ট রূপক আছে। এ এক অনাগত ভবিষ্যতের কাহিনী—যেদিন 'গামা' রশ্মির ক্রিয়ায় পৃথিবীর সমস্ত মানবকুল নির্মূল হয়েছে এবং ইঁদুরেরা ক্রম-বিবর্তনের ধারায় মানুষে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধলিপ্সু বিশ্ব-সংহারোদ্যত এ-যুগের মানব-সমাজের প্রতি অসহ্য ঘৃণায় পরশুরাম তাদের ইঁদুর বলে কল্পনা করেছেন। এম্‌নি ঘৃণা থেকেই জোনাথান্ সুইফ্‌টও মানুষের 'লিলিপুট'-রূপ রচনা করেছিলেন।

পরশুরামের গল্পে এই ইঁদুর-মানুষেরা যথাসময়ে মানুষের লোভ, সন্দেহ ও স্বার্থপরতায় ভূষিত হয়েছে। পরশুরাম এদেরই নাম দিয়েছেন "গামানুষ।" স্পষ্টভাষায় মানবজাতির

পরিপূর্ণ বিনষ্টির বাণী প্রচার করতে হয়তো তাঁর কুণ্ঠাবোধ হয়েছে—তাই গল্পের শেষে ব্যোমবজ্রের "বিশ্বব্যাপক শান্তি-স্থাপক বোমা" গামানুষ জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষে লোপ করে দিয়েছে।

গল্পের শেষে লেখকের 'ভরতবাক্য' এই :

"মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তারপর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলস-গমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।"

বিশ্বখ্যাত লেখক ক্যাবেল চ্যাপেকেব 'The Robot' নামে একটি উপন্যাস আছে। এই উপন্যাসেব বিষয়বস্তুও 'ফিউচারিজ্‌ম' -অনাগত পৃথিবীতে মানুষ আর নেই—কেবল 'Robot'-দেরই আধিপত্য। কিন্তু চ্যাপেক কাহিনীর পরিণামে 'Robot'-এব অন্তরে প্রেম-প্রীতিব অঙ্কুর বিকাশ করে যখানে মানুষের পুনর্জন্মের এক অপূর্ব সম্ভাবনা এনেছেন, পরশুরাম সেখানে দশ-বিশ লক্ষ বছরের জন্যে মানবজাতির পূর্ণ লুপ্তি কল্পনা করেছেন। 'জাবালি' 'লম্বকর্ণে'র স্রষ্টা কী তিক্ততার জ্বালায় এই গল্প রচনা করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে 'তিন বিধাতা' গল্পের সমাপ্তিও মনে পড়তে পারে।

যুগ ও কালের ওপর শ্লেষাত্মক সমালোচনা পরশুরামের পরবর্তী অনেকগুলি গল্পেই আমরা পাই। 'গামানুষ জাতির

কথা'র মতো চূড়ান্ত নিদর্শন এর পরে আর নেই বটে, কিন্তু রাজনীতি, দেশপ্রেম ও মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে পরশুরামের মন যে প্রায় নৈরাজ্যে পৌঁছেছে, তার নিদর্শন আছে, 'শোনা কথা', 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি', 'গন্ধমাদন বৈঠক' প্রভৃতি গল্পে। 'রামরাজ্যে' মহাবীর হনুমানজী-প্রভাবিত ভূতনাথ এক পদাঘাতে কংগ্রেসী কানাই গাঙ্গুলী এবং কম্যুনিস্ট (বা বামপন্থী) ভুজঙ্গ ভঞ্জকে ধরাশায়ী করেছেন। এই গল্পের ভেতরে আর একটি উপগল্প আছে—সেটি "গোনর্দ" দেশের গো-জাতির কাহিনী। মূল ও শাখা গল্পটির মধ্য দিয়ে পরশুবাম প্রমাণ করতে চেয়েছেন—দেশের ভবিষ্যৎ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আজ যে রক্ষকের মহিমায় অবতীর্ণ, আগামী কাল সে ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ কববে। (গল্পকল্প)

'গন্ধমাদন বৈঠকে' (ধুস্তুরী মায়া) আমরা অপেক্ষাকৃত কোমল ভঙ্গিতে গামানুষ জাতির মতোই পৃথিবীবিনাশের বার্তা শুনতে পাই। মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের, হিংসা তথা বর্বরতার অবসান হবে "লোকহিতৈষী মহাত্মারা যদি অহিংসা ও মৈত্রী প্রচার করতে থাকেন," তাহলে তার সাহায্যেই "দশ-বিশ হাজার বৎসর" পরে। ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট্ বার্নার্ডশ বরং সে প্রতীক্ষা করতে রাজী আছেন, তাঁর চরিত্রের মুখে আমরা শুনেছি: "O God, That madest this beautiful earth, when will it be ready to receive Thy

saints? How long, O Lord, how long?" * কিন্তু পরশুরাম সে প্রতীক্ষা করতে রাজী নন। তাঁর 'গন্ধমাদন বৈঠকে'র পরশুরাম বলেছেন: "ওসব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকমর্ণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।"

লক্ষ্য করবার মতো, দলীয় মতবাদ সম্পর্কে পরশুরামের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিরূপতা দেখা দিয়েছে। তাই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বা দলীয়তা মাত্রেই তাঁর স্পষ্ট আক্রমণের বস্তু। কৌতুক এখন গৌণ, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা রূপকধর্মী রচনার সাহায্যে তিনি রাজনীতিবিবর্জিত মানবতাবাদের (Humanism-এর) জয়গান গেয়েছেন।

বিশেষভাবে সাম্যবাদী ভাবধারার (অথবা সাম্যবাদী দলগুলির?) ওপর তাঁর আক্রমণ সব চাইতে নিষ্ঠুর। একটি বিশিষ্ট মতবাদকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে পরশুরামের মতো উদারচিত্ত সংযতশিল্পীও যে কিভাবে স্বধর্মচ্যুত হতে পারেন, তার নিদর্শন তাঁর 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি'। (কৃষ্ণকলি)

রাজনৈতিক দল বা মতকে ব্যঙ্গ করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে—বিরোধী ভাবধারাকে প্রয়োজনমতো

* Saint Joan—Epilogue

আক্রমণ ও আঘাত তিনি নিশ্চয়ই করতে পারেন। কিন্তু শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়ে সেখানে যদি ক্রোধের আতিশয্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে– তা হলে তা পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাম্যবাদী আন্দোলনকে পরশুরাম নিশ্চয়ই কটাক্ষ করতে পারেন— মতনিরপেক্ষভাবে তাঁর কৌতুক আস্বাদনে গোঁড়া সাম্যবাদীও হয়তো বিমুখ হবেন না। কিন্তু 'বালখিল্যগণের উৎপত্তিতে' যে অপ্রত্যাশিত ক্লেদাক্ততা আছে, তা পরশুরামের কাছ থেকে অভাবিত। 'দ্বান্দ্বিক কবিতা'ও এই কারণেই মহিমাচ্যুত হয়েছে। 'মাঙ্গলিক' (নীলতারা) গল্পে চীন-ভারত মৈত্রীর বিরুদ্ধে যে আক্রমণ করা হয়েছে এবং কাইজারের "Yellow Peril"-র মতো যে পীতাতঙ্ক প্রকাশ পেয়েছে—তা-ও শিল্পী পরশুরামের কাছ থেকে আমাদের কাম্য নয়। তবে 'সরলাক্ষ হোম' আমলাতান্ত্রিকতার সার্থক সমালোচনা : 'হেন্‌স এগ এনলার্জমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন' ও 'অ্যাডভাইজার জেনারেল অভ স্কীম্‌স'—শ্লেষাত্মক হয়েও কৌতুকের প্রসন্নতা বহন করে।

শ্লেষগর্ভ ভঙ্গিটি পরশুরামের পরবর্তীকালের গল্পগুলিতে প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর থাকলেও কতগুলি বিচিত্র রকমের গল্পে তিনি পুরোনো মুন্‌শীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। 'এক গুঁয়ে বার্থা' (কৃষ্ণকলি), 'শিবামুখী চিমটে' (নীলতারা), 'ধুস্তুরী মায়া' ও 'যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট' (ধুস্তুরী মায়া) ইত্যাদি অদ্ভুত রসের গল্পে তাঁর কুঠার ঝকমকিয়ে উঠেছে! 'ষষ্ঠীর কৃপা'য় উদ্ভট রসের সঙ্গে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যার একটি

চমৎকার কাহিনী তিনি পরিবেশন করেছেন। 'আতাব পায়েস' (কৃষ্ণকলি) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তথাকথিত "নীতিবোধের" একটি সুন্দর তির্যক উদাহরণ। বিশুদ্ধ গল্পরসের দিক থেকে 'নীলতারা', 'রটন্তীকুমার', 'অগস্ত্যদ্বার', 'ভরতের ঝুমঝুমি' বা 'রেবতীর পতিলাভ' অতি উপাদেয় সৃষ্টি।

॥ ৪ ॥

বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ কৌতুকশিল্পী অধ্যাপক স্টিফেন লিকক্ কৌতুকের মর্মকথাটি অত্যন্ত চমৎকাব বলেছেন তাঁর 'Humour as I see It' নামীয় সুন্দর প্রবন্ধটিতে। তাঁর মতে কৌতুকরস বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতার মহত্তম সৃষ্টি—মানুষের গভীরতর অন্তর্লোকে বিচিত্রমুখী অসঙ্গতিব দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করে তার হাসি ও অশ্রুমিশ্রিত এক অপরূপ রসনিষ্পত্তি ঘটে থাকে। তাই "Mark Twain's *Huckleberry Finn* is a greater work than Kant's *Critique of Pure Reason*, and Charles Dickens' creation of Mr. Pickwick did more for the elevation of human race—I say it in all seriousness—than Cardinal Newman's *Lead, Kindly Light* etc. Newman only cried out for light in the gloom of a sad world. Dickens gave it."

সার্থক কৌতুকের এই যে চরম ফলপ্রাপ্তি লিকক নির্দেশ করেছেন, এর মধ্যে হয়তো সামান্য আতিশয্য থাকতে পারে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের হিউমার যে মানুষকে উন্নত উদ্বোধিত করতে সক্ষম, তাতে সংশয় নেই। এ যুগের সাহিত্যে কৌতুক তাই গোপাল ভাঁড়জাতীয় স্থূলরুচিপরিচর্যা নয়, ক্রোধের মাত্রাতিরিক্ত নগ্ন শ্লেষও নয়। তার একটা সূক্ষ্ম সৌকুমার্য আছে, শোভন সুরুচির সংযম আছে এবং তার উপস্থাপনা "Without harm and without malice ;" ক্রোধ কিংবা জ্বালা যদি প্রেরণা-রূপে থাকেও, তাকে যতটা সম্ভব গুহাহিত করে রাখাই প্রথম শ্রেণীর কৌতুককারের কলারীতি।

পরশুরামের রচনার প্রারম্ভ পর্যায়ে আমরা লিকক্-ব্যাখ্যাত এই প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টার পদধ্বনিই শুনেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তাঁকে এবং বাংলা সাহিত্যকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বহুকাল আগেই হ্যাজলিট্ 'Wit and Humour' তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে * মনে করিয়ে দিয়েছিলেন একটি ভারকেন্দ্রের একদিকে কৌতুক অপরদিকে বিষাদ--কেন্দ্র বিচলিত হলেই একটি অপরটিতে পরিণত হয়। যুদ্ধকালীন দুর্লগ্নে পরশুরামের সেই কেন্দ্রে বিক্ষোভ ঘটেছে—তার ফলে গড্ডলিকা-কজ্জলী-হনুমানের স্বপ্নের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে। 'গামানুষ জাতির গল্প' তাই হাসির সৃষ্টি করে না—আতঙ্কে আমরা শিউরে উঠি।

* English Comic Writers, Lecture 1.

কমেডি এখানে ট্র্যাজেডিতে রূপায়িত হয়েছে। অথচ লিকক্ গোত্রের শিল্পী বোল্‌তের হতে পারেন না বলে' পরশুরামের মধ্যে যে দ্বিধাভক্তি ঘটেছে এবং অসামঞ্জস্য রচনা করেছে, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তা শুভ হয়নি। 'বাল্যখিল্যদের কাহিনী' কিংবা 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' তারই বেদনাদায়ক নিদর্শন।

তবু পরিণত বয়সে পরশুরাম আজও আমাদের মধ্যে আছেন এবং তাঁর লেখনী এখনো সজাগ। স্বভাবতই একান্ত গুণমুগ্ধ বাঙালি পাঠক তাঁর শতায়ু কামনা করবেন। "কজ্জলী"র শিল্পীকে "নীল তারায়" না পেলেও ক্ষতি নেই—যা পাই তাতেই আমরা লাভবান।

একটি সম্পদ পবশুরামের এখনো অব্যয়িত। সে তাঁর স্টাইল। 'বাগর্থসম্পৃক্তির' নিরুপম নিদর্শন তাঁর ভাষা। তাঁর রচনা এখনো সূর্যালোকিত স্রোতোধারার মতো বহমান, তাতে বস্তুতন্ত্রযুগের বীরবলী বক্রতার সঙ্গে রাবীন্দ্রিক মাধুর্যের মিলন অপরূপ যুক্তবেণী রচনা করে রেখেছে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

'দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী'

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

॥ ১ ॥

"Medicine is my lawful wife and literature is my mistress. When I get tired of one, I spend the night with the other"—এ-কথা শেকভ বলেছিলেন। অবশ্য অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-ফার্মাকোপিয়ার জগতে ডাক্তার শেকভের কোনো কৃতিত্বের খবরই চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো পুঁথিতে লেখা নেই। তাঁর পরকীয়া 'ডার্লিং'-ই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কথাটা মনে পড়ল প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে। চিত্র-পরিচালকের কথা ভাবছি না--কিন্তু সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা এবং গল্পের কোন্‌টিকে বলবেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী--কাকে চিহ্নিত করবেন নর্মসঙ্গিনীরূপে? কে তাঁর বৈধী, কে তাঁর রাগানুগা?

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্ভবত উত্তর দিতে পারবেন না। তাঁর পাঠকেরাও নন্‌। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই বাংলা দেশে দ্বিতীয় শিল্পী—যিনি ছোটগল্পে এবং কবিতায়

সমোন্নত শীর্ষবিহার করেছেন।* প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যিক সত্তা নিয়ে যদি কবি ও গল্পকারদের মধ্যে সন্ত্ কবীরের শবদেহের মতো বিরোধ বাধে, তা হলে কবীরের ভক্তদলের মতোই কোনো পক্ষ নিরাশ হবেন না।

বহু ভাষণ ও বহুতর শ্রুতিতে জীর্ণ হয়ে গেলেও এ-কথা আজ পর্যন্ত সত্য যে একটি বিশিষ্ট মানসিকতাই গীতিকবি এবং গল্পকারকে সৃষ্টি করে থাকে। যে-কোনো সার্থক গল্পকারই সৎকবি হতে পারেন এবং যে-কোনো সিদ্ধকাম কবির পক্ষেই গাল্পিক সাফল্য আয়াসলভ্য নয়। বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ বা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাদ দিলেও পুশ্‌কিন—এড্‌গার অ্যালান পো—ডি, এইচ্‌ লরেন্স্‌ সকলেই এই উক্তিটি বারে বারে প্রমাণ করেছেন।

অবশ্য সব গীতিকবিই (Lyric poet-এর এইটিই অতৃপ্তি-জনক বঙ্গানুবাদ) যে গল্প লিখেছেন তা নয়—একান্তভাবে যাঁরা গল্পলেখক তাঁদের দিক থেকে কাব্য রচনার প্রয়াস আরো কম। কিন্তু প্রতীতির (Impression-এর) এবং কল্পনার বৈশিষ্ট্যে তাঁরা সমপর্যায়ী। মপাসাঁর কবিতার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই—যদি কোনো কাব্যচর্চা তিনি কখনো করে থাকেন তবে তা প্রত্নবিদ্যার আবিষ্করণীয়—কোনো পাঠক বা

* অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু এবং প্রমথনাথ বিশীর কৃতিত্বও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সংপ্রতি প্রকাশিত জীবনানন্দের কয়েকটি গল্পও বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আশা করি।

সমালোচকও সম্ভবত সে চেষ্টা করবেন না। অথচ তা সত্ত্বেও ক্রোচে তাঁর "কাব্য ও অকাব্য" নির্ণয় প্রসঙ্গে মপাসাঁর গল্পের 'লিরিক'-সৌন্দর্য সানন্দে উপলব্ধি করেছেন। *

কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ংপ্রকাশ। তাই তাঁর গল্পের মধ্যে কাব্যমূলকতা সন্ধান করবার জন্যে আমাদের বিব্রত হতে হয় না। গল্পকারের মিতভাষিতা এবং কবির ব্যঞ্জনা তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে সার্থক ক্ষীর-শর্করা রচনা করেছে, সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছে নিও-রোমান্টিক্ যুগের মহিমাসুন্দর পূর্ণতর মহত্তর জীবনের অভীপ্সা। আর এই সব কারণেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি অসপত্ন আসনের অধিকারী।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটিকে 'কল্লোল যুগ' বলা হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই পর্বের অন্যতম প্রতিনিধি। এই কল্লোলীয়দের সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইটিতে তাঁর সহমর্মীদের চমৎকার অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। সামকালিক বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত অতৃপ্তি, বেদনা, স্বপ্ন ও সাধনা অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যিক সরসতায় এবং সমানধর্মার আন্তরিকতায় তাঁর বইতে উপস্থিত করতে পেরেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি চিঠিও এই বইতে আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা

* Poetry and Non-Poetry—Croce

হয়েছে— তাদের সহায়তায় কেবল পত্রলেখকের মনোজগতের সঙ্গেই যে আমরা পরিচিত হই তা নয়—কল্লোলীয় জীবন-দর্শনেরও একটা মোটামুটি ভাবরূপ এদের মধ্যে আভাসিত হয়ে ওঠে।

বস্তুত, 'কল্লোলীয়েরা' কী চেয়েছিলেন? খুব সুস্পষ্টভাবেই বলা যায়, জীবনানন্দের ভাষায় "নষ্ট শশা, পচা চালকুমড়ার ছাঁচের" এই জীবনবৃত্তের ওপারে আর এক সৌন্দর্যপ্রোজ্জ্বল সার্থকতা যার স্বাদ "গভীর গভীর।" তাদের এক চোখে অশ্রু, এক চোখে জ্বালা আর শিল্পীর তৃতীয় নয়নে সুন্দরের ধ্যানমূর্তি। ইংরেজি রোম্যান্টিক্ যুগের সঙ্গে এই মনোভঙ্গির পার্থক্য সামান্যই। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল প্রথম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের মণ্ডনকলা। শেভিয়ানিজম্, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় 'প্যানের' প্রেম, 'ভ্যাগাবণ্ডের' যাযাবরী বৃত্তি, 'দি গ্রেট্ হাঙ্গারের' জ্বালা এবং ইংল্যাণ্ডের 'ব্লুম্‌স্‌বেরি' সাহিত্যিক গোষ্ঠীর তির্যক্ প্রেক্ষণ।

প্রসাধনের আবরণটুকু অপসারিত হলে রোম্যান্টিক্ যুগের সমস্ত মৌলিক লক্ষণগুলোই কল্লোলীয়দের মধ্যে লভ্য। আসলে, যে-কোনো যুগসন্ধির যন্ত্রণাই এক, তার তিক্ততার রূপ প্রায় অভিন্ন, তার মুক্তির অভীপ্সা সমান উদগ্র, তার দূরাভিসারে অনুরূপ কল্পনা-শাবল্য। আর এই যুগসন্ধি যেমন ভিত্তিনির্ভর-উপন্যাসের দুর্দিন, তেম্‌নি কবিতা এবং ছোটগল্পের মহোৎসব। তাই কল্লোলীয়েরা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ করেছেন,

কিন্তু কবিতায় ও ছোটগল্পে তাঁরা যে জোয়ার এনে দিয়েছিলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্য তারই পলিমাটিতে ফসল ফলিয়ে চলেছে। এই যুগের যন্ত্রণাই হল ইংরেজি কবিতার শ্রেষ্ঠ অধ্যায় এবং ফরাসী ও রুশ গল্পের উত্তরঙ্গ উল্লাস।

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা নৈরাজ্যবাদী হলেও মোটের ওপর নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। কারো কারো মধ্যে তিক্ততা হয়তো কিছু কিছু প্রবল হয়ে উঠেছে, কখনো কখনো হয়তো মনে হয়েছে যন্ত্রণার এই অন্ধ কারাবৃতি থেকে বুঝি কোথাও মুক্তি নেই, কিন্তু কল্লোল-গোত্রীয়দের সকলের শেষ কথা তা নয়। অন্তত প্রেমেন্দ্র মিত্রের তো নয়ই। 'কল্লোল যুগে' উদ্ধৃত তাঁর পত্রাংশ থেকে পুনরুদ্ধৃত করা যাক :

"দুঃখও দেখেছি বটে, দেখেছি কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহঙ্কার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ, রুগ্ন-গলিত শব। তবু—

......এ দেখেও আবার যখন শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপ্‌সা নদীর ওপর দিয়ে মন্থর না' খানি যেতে দেখি স্বপ্নের মতো পাল তুলে, যখন দেখি পথের কোল পর্যন্ত তরুণ নির্ভয় ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে, দুপুরের অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে শালিকের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয় না আমার মত না নিয়ে আমায় এই দুঃখভরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।" (পৃষ্ঠা ২৬)

সুতরাং জীবনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বীভৎস বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও পত্রলেখক তার রূপের দিক, তার রসের দিক, তার আনন্দের দিক সম্পর্কে আরো বেশি সজাগ। অভিযোগ কেবল এই, বিকৃতি প্রতি পলে পলে রাহুর মতো রূপকে গ্রাস করে, বীভৎসতা তিলে তিলে হনন করে আনন্দকে, অজগরের দৃষ্টিস্তম্ভিত হরিণের মতো জীবন দুর্নিবার ভাবে মরণাভিমুখী হয়ে চলে। অতএব "জীবনবিধাতা"র কাছে বিদ্রোহী তার "প্রীতিহীন প্রণিপাত" নিবেদন ক'রে "কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষের" অর্ঘ্য দেয়; সে দেখতে পায় "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে" তার বন্দী ভগবানের কান্না—সে আর্তস্বরে বলে "কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।"

চূড়ান্ত হতাশায় চেতনা যখন অবলীন, তখনই মধ্যে মধ্যে ঐকান্তিক নেতিবাদ এসে শিল্পিসত্তাকে আচ্ছন্ন করে; দেবতা তখন পরিগ্রহ করে ইউলিসিসের অন্ধ দৈত্যের রূপ; দুর্বহ দুঃসহ দিনচর্যাকে তখন অলক্ষ্য এক নিষ্ঠুরের ক্রূর ব্যঙ্গের মতো মনে হয়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে তাই আমরা শুনতে পাই :

"মনে কবি ভালবাসব
শপথ করি এ জীবন হবে প্রেমের তপস্যা।
প্রভাতের আলোকে চোখ থেকে বুকে আমন্ত্রণ করি।···
···বিদ্রোহ আমি করব না, জীবনকে আমি তিক্ত মুখে
অভিশাপ দেব না,
যে শেষ নিঃশ্বাসটি পৃথিবীকে দিয়ে যাব তাতে বিষ থাকবে না,

থাকবে শুধু চিরকালের নবসূর্যোদয়ের জন্যে চিরন্তন প্রণতি,
ভ্রূণ ভবিষ্যতের জন্যে শাশ্বত আশীর্বাদ—"

(প্রথমা, সংশয়)

কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি, জীবন সম্পর্কে এই প্রসন্ন প্রেম ও মমতার অনুভূতি বেশিক্ষণ থাকে না। তার পরেই সব কিছুর অন্তরাল থেকে হঠাৎ কদর্য নিষ্ঠুরতা আত্মপ্রকাশ করে– একটা বীভৎস নির্মমতায় কবিদৃষ্টি সমাবিল হয়ে যায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চোখে পড়ে আকাশ অন্ধ হয়ে গেছে, আর :

"পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নির্মম শিশুর দল
ক'টা ইঁদুরছানা ধ'রে
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে– কি সবল পৈশাচিকতা!
সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা।...
...জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ?" (ঐ)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পর্কে সব চাইতে বড় কথা এই : তবু তিনি এই বিদ্রূপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। তাকে দেখেছেন, তার জ্বালায় জর্জরিত হয়েছেন, অমোঘ মৃত্যুর কাছে প্রাণের পরাজয়ে বার বাব কণ্ঠে অভিশাপ উদ্গত হয়েছে—তবু শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর একান্ত অবক্ষয়ের মধ্যেও সেই যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল, নজরুল ইস্‌লামের যে সমুদ্বেল প্রাণোচ্ছ্বাস কল্লোলীয়দের মধ্যে এসে আছড়ে পড়েছিল, তারই ফলে অন্ধ কারাগারে

বাস করেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আলোর দিকে দৃষ্টি মেলে রাখতে পেরেছেন। সেই আলোর চরণধ্বনি তিনি শুনেছেন "পাঁওদলে"—যেখানে "মলিন কোর্তাপরা কারখানার কুলি আসছে আজ অসঙ্কোচে, আর রাস্তার মূর্খ মজুর—"; সেই আলোর আহ্বানে তিনি "সাগব পাখী"দের সঙ্গে আকাশে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন, "বাঘের কপিশ চোখে" জঙ্গলের ছায়া দেখে আদিম অরণ্যের এক বলিষ্ঠতর ঋজু জীবনেব স্বপ্ন দেখেছেন তিনি, "হে-ইডি, হাইডি, হা-ই"-এব বন্য গর্জনের মধ্যেই তিনি সভ্যতার সার্থকতাকে খুঁজতে চেয়েছেন :

"সভ্যতাকে সুস্থ কবো, কবো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো, মৃত্যুব স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে যাদেব জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তেব বিনিময।
ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-কবা অরণ্যেব জগতে
কি লাভ গড়ে' কৃমি-কীটের সভ্যতা"

(সম্রাট, নীলকণ্ঠ)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই আলোক-জিজ্ঞাসার মধ্যে স্বভাবতই কিছু স্ব-বিরোধ চোখে পড়বে। কখনো কখনো তাঁর প্রগাঢ় জীবনাসক্তি—"কান পেতে শোন্ বসে জীবনেব উন্মত্ত কল্লোল", কখনো তিনি জীবনের কাছ থেকে প্রায়-পলাতক। কখনো কর্মী মানুষের পদযাত্রায় তিনি "ভয়মুক্ত মানবের" ভবিষ্যৎকে দেখতে পান, আর পরক্ষণেই আদিমতাব আরণ্য-আহ্বান তাঁকে

দূবাপস্থত করে। কখনো তাঁকে একান্ত তুঃখবাদী বলে ভ্রম হয়, কখনো "জীবন মহাদেবের" নৃত্যলীলায় তিনি নির্মোহ নটশিষ্য রূপে পদক্ষেপ করেন—আবার তাবপরেই "কয়লা আর ধাতু আর হীরকে" বিজ্ঞান যে ভবিষ্যতের পথ কেটে চলেছে, সেই পথচারণাতেই তিনি পান মুক্তি—"অসমাপ্তির অসীমতা।"

যে কালভূমিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকাশ, তাঁর কবি-মানস ও জীবন-প্রতীতির অনিশ্চয়তা সেই ভূমিরই শস্য। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী বিকৃতি ও ক্ষোভে জর্জরিত, জ্বালার তার অন্ত নেই—এই তুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি তার স্বতঃই কাম্য। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত মুক্তি কোন্ পথ দিয়ে আবির্ভূত হবে—তার সন্ধান সে তখনো পায় নি। নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাম্যবাদী চিন্তার প্রথম অরুণস্পর্শ সে পেয়েছে—অথচ তাকে সম্পূর্ণ বরণ করবার মতো সে নিঃসংশয় হয়নি, অথবা তার তাৎপর্য তখনো তার কাছে স্পষ্টরেখ নয়। তাই তার মধ্যে একাধারে সংগ্রামী ও পলাতক—বিজ্ঞান-মানস এবং আদিমতা-সংসক্তি; তাই মায়াকোভ্স্কির নাগরিকতা আর রুসোর অরণ্যপ্রীতি, তার কাছে সমার্থক।

যুগসুলভ এই বিভ্রান্তি সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্র মহত্তর তাৎপর্যের সন্ধিৎসু, পূর্ণতর সৌন্দর্যের পিপাসু, গভীরতর ব্যঞ্জনার রসিক, দিনযাপনের গ্লানির বাইরে মহাপৃথিবীর সমুদ্র বনানী-গিরিচূড়ার অভিযাত্রিক। "মহাসাগরের নামহীনকূলে" যে সব "ভাঙা জাহাজের ভিড়"—তাদের ছেঁড়া পালেও আবার

নব তটভূমি আবিষ্কারের আকুলতায় যে উনপঞ্চাশ পবনের বেগ লাগবে —তিনি তার প্রত্যয়ী। মহত্তর-বৃহত্তরের এই এষণাই তাঁর কবিতায়, গল্পে অথবা শিশুসাহিত্যে এমন ভৌগোলিক বিস্তৃতি নিয়ে এসেছে। আফ্রিকার তিমিরস্তব্ধ হিংস্র বনভূমি থেকে তুষারকীর্ণ মেরু-বিস্তৃতি পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর মানস পরিক্রমা— Imaginary Expedition.

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন-বিশ্লেষণ এবং মুক্তি-বাসনার মধ্যে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি নেই। যেটুকু অস্বচ্ছতা বা অনিশ্চয়তা, তার দায়িত্ব যুগগত। ম্যারিয়্যাক, ফ্লোবের-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় যে মূল্যায়ন করেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য :

"For him, everything happens as though humanity, in search of the light, kept mistaking the door." (Great Men, Gustave Flaubert)

কস্মৈ দেবায ? কোন্ পন্থা ?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পেও "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে" বন্দী মানুষেরা আলোর সন্ধান করে ফিরেছে। কিন্তু তারা "Kept mistaking the door."

অথবা কেবল প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই বা কেন? এ হয়তো 'কল্লোলেরই' মর্মসত্য।

॥ ৩ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প, 'শুধু কেরাণী।'

এই গল্পটিতেই বাংলা সাহিত্যে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আজকের দিনে এই গল্পে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন দীন কেরাণী এবং তার স্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের কথা আর পরিণামে স্ত্রীর মৃত্যুতে তার সমাধি—গল্পের বক্তব্য এই। তবু সন্দেহ নেই, সেদিন এই গল্পেই এমন একটা বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হয়েছিল—যা বাংলা সাহিত্যে এর আগে ঠিক এমন করে বাজেনি। গল্পের শেষে মেয়েটি যখন "কেঁদে ফেলে বললে, 'আমি মরতে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু –" তখন ওই "কিন্তু" তীরের মতো পাঠকের বুকে এসে আঘাত করে। এ শুধু ব্যক্তির বেদনাকেই প্রকাশ করে না –একটা যুগের ইঙ্গিতকেও বহন করে আনে।

এর আগে বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনচর্চা যে না হয়েছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথের উদার সমদৃষ্টিতে বাঙালি জীবনের সমস্ত অন্ত-প্রত্যন্তই অল্প বিস্তর উদ্ভাসিত ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মধ্যজীবীর বেদনা-ব্যর্থতাকে অন্যান্য লেখকেরাও কিছু কিছু অবলম্বন করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় এই ত্রিশঙ্কু-শ্রেণীর সংকটের রূপটি গল্পটিতে 'ফোকাসের' মতো বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

গল্পটি প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন: "সেই মুহূর্তে হিলিও ট্রোপ রঙের শাড়ি পরে রডোড্রেনডন গাছের তলায় যারা অনুরাগের রঙিন খেলা খেলে (মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'?), তাদের কথা আমার কাছে যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। মনে হল রাঙা মাটির পাহাড়ী দেশে বিবাগী হয়ে ইউক্যালিপ্টাস গাছের তলায় বসে যারা বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের বেদনা নেহাত জোলো।

কিছু যাদের নেই,—যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য এক-রঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোনো গল্প কি হতে পারে না? হোক বা না হোক, তাদের কথাই লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লিখলাম শুধু এক কেরাণীর গল্প। সেই গল্পের নামই "শুধু কেরাণী।' ("গল্প লেখার গল্প"—জ্যোতিঃপ্রসাদ বসু সম্পাদিত)

বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি এই সহানুভূতি, স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বর ও নির্মম মৃত্যুর উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ, ব্যথা ও বিকৃতির উৎস সন্ধানে মনোলোকের গহনে অনুসন্ধান এবং এই সঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মূঢ় আত্মবঞ্চনার উন্মোচন—মোটামুটি ভাবে এরাই গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের আশ্রেয়। এই বিষয়-বস্তুর আঙ্গিক রচনা করেছে তাঁর সংযত পরিচ্ছন্ন ভাষা ও কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং ফলে "Psychological and imaginative reality"তে তাঁর ছোটগল্পগুলি অনন্যস্বাদী। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ-ব্যতিরিক্ত বাংলা ছোটগল্পে আঙ্গিকের দিক থেকে

সব চেয়ে সিদ্ধকাম শিল্পী হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পীড়িত প্রবঞ্চিত যুগব্রাত্যদের প্রতি সহানুভূতি 'শুধু কেরাণী' রচনার পূর্বেই সংকেতিত হয়েছিল তাঁর "পাঁক" উপন্যাসে। নিম্নমধ্যবিত্তের বেদনাভূমিতে পৌঁছুবার আগেই আরো নীচের দিকে—আরো "Lower Depths"-এ তিনি অবতরণ করেছিলেন। বস্তিবাসী, নিম্ন শ্রেণীর গণিকা, চোর, হিন্দুস্থানী গৈঠাওয়ালী, ঘমণ্ডী এবং তার ছাগলের দুধ ব্যবসায়িনী স্ত্রী ('মোট বারো')—এরা প্রত্যেকেই তাঁর সাহিত্যে সমানুভূতির নৈকট্যে ও পর্যবেক্ষণের নৈপুণ্যে আশ্চর্য সার্থক হয়ে উঠেছে।

এই নীচের তলার সঙ্গে মর্মসম্বন্ধ কল্লোলীয়দের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। শৈলজানন্দ নিজে খোলার বস্তিতে থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, "যুবনাশ্ব" মণীশ ঘটক "পটলডাঙার পাঁচালী"তে 'বিকৃত জীবনের কারখানা' খুলে বসেছেন। এর পেছনে তাঁদের যুগমানস এবং হাম্‌সুন্‌-গোর্কীর প্রভাব সমভাবে উপস্থিত ছিল।

অধঃপতিত এই প্রাণযাত্রা—যেখানে মানুষ "live like hogs"—তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'মহানগর', 'পোনাঘাট পেরিয়ে' (এই গল্পটি পড়ে তারাশঙ্কর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন) এবং 'সংসার-সীমান্তে'-কে। 'মোট বারো' এরই আর একটা সকৌতুক দিক।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' নামটি লেখকেরই 'দেবতার জন্ম হল' কবিতা থেকে গৃহীত। কবিতায় যা সূত্রাকারে বিবৃত হয়েছে গল্পে যেন লেখক তাকেই উদাহৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

"আর দিন সুন্দর আমার
স্বার্থে লোভে ক্রূরতায়, হিংসার প্রচণ্ড লালসায়
কুৎসিত জঘন্য, ভয়ঙ্কর মানবের পুরী হতে,
পঙ্কমাখা, শীর্ণ, ক্ষীণ, হিংসায় বিক্ষত
কদাকার, লালসাজর্জর—"

যে করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, গল্পের নায়িকা অপগতযৌবনা বেগুন তারই প্রতীক। শ্রীহীন, কুৎসিত, ক্ষুধায় জর্জরিত গণিকা-জীবনের যে ছবি এই গল্পে ফুটে উঠেছে এবং গল্পের শেষে যার "ওপরের ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাঁতি ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখখানাকে বীভৎস করে তুলেছে, আর বাঁ দিকে সমস্ত গাল যেন কবে আগুনে ঝলসে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে"—সেই কপর্দকহীন কামুকের সঙ্গে যখন 'অসীম অসহায় হতাশায়' নিশিযাপনের সংকল্প করে বেগুন, তখন সে যেন তার এই ক্লেদক্লিন্ন অভিশপ্ত অস্তিত্বের চরম পরিণামকেই বেছে নেয়। এ যেন পৃথিবীর পঙ্ককুণ্ডের সমস্ত হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে দিয়ে শয়তানের হাত ধরে নরকের পথে তার অন্তিম তীর্থযাত্রা।

গল্পটির "Nauseating Reality" ছাড়া আরো বড় বক্তব্য আছে—সে হল ছত্রে ছত্রে আভাস ইঙ্গিতে জীবন-মমতার

অনুরণন। গণিকা-জীবন সম্পর্কে করুণার্দ্র মানবিক দৃষ্টি শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যেও আমরা পেয়েছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রীয় রূপাজীবার দল সাহিত্যে পরিবেশনযোগ্য ও সংস্কারসিদ্ধভাবে পরিমার্জিত, তাদের আত্মায় মধ্যবিত্তসুলভ পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম এমন কি পাতিব্রত্য পর্যন্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য কল্লোলীয়েরা এদিক থেকে অনেক সত্যনিষ্ঠ। বস্তুত 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' আমাদের কুপ্রিনের 'ইয়ামার' গ্লানিজর্জরিত নারীত্ব এবং তার বেদনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আরো মনে পড়িয়ে দেয়, বাংলা সাহিত্যে ফরাসী ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ অবিকৃত-ভাবে আসে নি, রুশ সাহিত্যের জীবনতৃষ্ণা তাকে সুন্দরতর করে তুলেছে বধ্যভূমির রক্তধারায় তা রক্তকুসুমের ইঙ্গিত বহন করেছে।

আরো পরিষ্কারভাবে তার আভাস পাওয়া যাবে 'সংসার সীমান্তে' গল্পটিতে। এ গল্পেও নায়িকা বস্তিবাসিনী বারবধূ এবং নায়ক একজন চোর। পলাতক চোর অঘোর প্রায় জোর করে এসেই রজনীর ঘরে আশ্রয় নিলে। সে আশ্রয় তার পক্ষে অবশ্য সহজলভ্য হল না। মার খেয়েও আহত রক্তাক্ত অঘোর শেষ পর্যন্ত রজনীরই গলগ্রহ হয়ে রইল এবং পরিণামে ঘৃণা, বিরক্তি ও বিদ্বেষের কুটিল রন্ধ্র আশ্রয় করেই দুজনের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হল। সেই প্রেমের স্পর্শে অঘোর যখন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বেঁচে উঠতে চাইল, তখনই তার পাঁচ বছরের জন্যে জেল হয়ে গেল। "হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর

সাক্ষী করিয়া শপথ" করে অঘোর বিচারপতিকে জানালো "সত্যই সে এ পথ ছাড়িয়া দিতে চায়।" কিন্তু আইনের কাছে সে মার্জনা পেলো না। সে জেলে পচতে লাগল। আর "ডিবিয়ার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনো নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা বজনী হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।"

গল্পটির কারুণ্য স্বয়ংপ্রকাশ। ভাবসাধর্ম্যে 'সংসার-সীমান্তে' ও' হেনরীর 'The Cop and the Anthem' গল্পটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। এই গল্পেরও নায়ক দাগী চোর Soapy যখন নিজের সমস্ত অতীতের ভ্রান্তি সংশোধন করে সচ্চিত্ত হয়ে উঠতে চাইল ঠিক তখনই সে পুলিসের হাতে ধরা পড়ল। 'সংসার-সীমান্তে'তে প্রতীক্ষমানা বজনীর বেদনা-ক্লিষ্টতা আরো বিস্তৃত একটি করুণ মাধুর্য রচনা করে দিয়েছে— যা ও' হেনরীর গল্পটিতে পাওয়া যায় না।

নীচুতলার নরনারীর মিলনকে ভিত্ত করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'প্রাগৈতিহাসিক'—কিন্তু সে গল্পে আদিম জৈব-শক্তিরই হিংস্র উল্লাস—প্রাগৈতিহাসিক পুরুষ কী করে বীরভোগ্যা নারীকে একখণ্ড মাংসের মতো লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত—তারই অন্ধকার ইতিহাস। আধুনিককালে ইতালীয় মোরাভিয়ার জনপ্রিয় উপন্যাস "The Woman of Rome"-এও বারাঙ্গনা এবং দস্যুর প্রেমের কাহিনী আছে—কিন্তু সে

লালসার এক নির্লজ্জ ইতিবৃত্ত। 'সংসার-সীমান্তে' সুর মানবতাধর্মী—সাশ্রু সহানুভূতিই এর উৎসকেন্দ্র।

'মহানগর' গল্পে লেখকের চোখের জল একটি সরল কাহিনীর মাধ্যমে একেবারে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। ছোট ভাই ছেলে-মানুষ রতন কলকাতায় এসেছে তার দিদির খোঁজে। সে জানে না তার দিদি চপলা কুলত্যাগিনী, জানে না জীবিকার জন্য চপলা শেষ পর্যন্ত নরকে আশ্রয় নিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য ভাই-বোনের সাক্ষাৎকার—তারপর রতন বিদায় নিয়ে গেলে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়ানো চপলার মূর্তিটি রজনীর ছবিটির মতোই হতাশ বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

গণিকা-জীবনের নারীত্বের দিকটি শরৎচন্দ্রই প্রথমে সং-সাহসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছিলেন—কল্লোলীয়েরা তাকে আরো বস্তুভূমক করে তুলেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিদৃষ্টিতে তা অপরূপ স্নিগ্ধতা লাভ করেছে। প্রসঙ্গত অচিন্ত্যকুমারের 'ইতি' গল্পটি স্মরণযোগ্য।

'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পের বলাই এই বিকৃত জীবনের এক কুটিল আক্রোশের অভিব্যক্তি। কিন্তু দৃষ্টি যেখানে আচ্ছন্ন এবং বুদ্ধি যখন আবিল—তখন সে আক্রোশের পরিণামও ব্যর্থ। খোঁড়া বাবুর গোলায় আগুন দিতে গিয়ে ভুলে বলাই নিরীহ দরিদ্রেরই সর্বনাশ করে বসে। অন্ধ বন্দীর বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত কী নিষ্ঠুর পরিহাসে রূপান্তরিত হয় এই গল্পে সেই কথাই বলা হয়েছে।

এই বিকল মনুষ্যত্বের আর এক ধাপ উর্ধ্বে যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত তার কাহিনী আছে 'শুধু কেরাণী', 'লাল তারিখ', 'চুরি' এবং 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, নৈরাশ্য এবং উৎকণ্ঠার পব কেরানী যুগলের ছুটির 'লাল তারিখ'টি এল। কিন্তু জ্বর নিয়ে, ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে বিরহী যুগল যখন বাড়িতে এসে পৌঁছুল, তখন স্ত্রীও জ্বরে শয্যাশায়িনী। দীন কেরানীর ছুটির আনন্দ-স্বপ্নটুকু মিলিয়ে গেল মুহূর্তেব মধ্যে। ভারবাহী পশুর মতো জীবনেব বোঝা টেনে যাদের বেঁচে থাকতে হয়—তাদের কয়েকটি মুহূর্তের স্বপ্নকামনাও যে নিছক মরীচিকা—এই গল্পে সেই ট্র্যাজেডীই সংকেতিত হয়েছে। যুগলের দল তবু আত্মবঞ্চনা করতে ছাড়ে না :

"যূথিকারও জ্বর! মাঝের ঘবে যেতে যেতে যুগলের মনটা কি দমে যায়?

না, মন দমবার কি আছে। সে জানে কালকেই না হয় পবশু সব ঠিক হয়ে যাবে—আবাব সব ভালো লাগবে এমনটি সে ভেবেছে।"

'ভবিষ্যতের ভার' গল্পটি শিক্ষকতা জীবনের একটি নিখুঁত চিত্রণ। গল্পের উত্তম পুরুষ যখন শহরতলীর একটি দীন বাংলা স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এলেন—তখন তাঁর উঁচু দরের আদর্শবাদ ছিল—এই সামান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সার্থক বিদ্যায়তন করে তোলবার সাধু সংকল্প ছিল। পণ্ডিতদের কুশ্রীতা, ও ইতরতা, সেকেণ্ড মাস্টারের চালিয়াতী এবং ফাঁকিবাজী তাঁকে

আঘাত করত। যাদের হাতে ভবিষ্যৎ গঠনের ভার—এই তাদের রূপ? একে বদলাতে হবে। শেষ পর্যন্ত বদলালো ঠিকই—কিন্তু স্কুল নয়। অভাবে, আত্মবঞ্চনায় এবং ক্রমাবক্ষয়ে আদর্শবাদী হেড মাস্টার কেমন করে তাঁর সহকর্মীদের দলে নেমে এলেন তারই এক অদ্ভুত বাস্তব কাহিনী তীব্র তিক্ততায় এই গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত এর আগে শিক্ষক-জীবনের এমন বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে আর পাওয়া যায় নি।

'চুরি' যেন এরই পরিপূরক। সারা জীবন শিক্ষাব্রতী সদাচারী প্যারিমোহনবাবু পরিশেষে আবিষ্কার করেছেন এতদিন ধরে তাঁর পরিক্রমা ঘটেছে মূঢ়তারই পেছনে। প্যাবিমোহনের ট্র্যাজেডি চরমে পৌঁছেছে যখন তিনি দেখেছেন সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সত্যনিষ্ঠার পুরষ্কার তিনি পেয়েছেন উত্তরাধিকারীর হাতে—তাঁর নিজের ছেলে নেপুই চোর হয়ে উঠেছে। 'ভবিষ্যত্যের ভার' গল্পে যার সূচনা, 'চুরি'তে যেন তারই সমাপ্তি ঘটেছে। এই দুটি গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্রধর্ম "নির্দেশিত অঙ্গুলি" (Pointing Finger) এই রচনাদুটিতে স্পষ্ট লক্ষণে প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি স্মরণীয় গল্প 'পুন্নাম।' লেখন-কুশলতার দিক থেকে এটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যতম সার্থক রচনা। জীবনরীতির একটি কুৎসিত অসঙ্গতির দিক 'পুন্নামে' প্রকটিত হয়েছে। কল্লোলীয়দের অনুপ্রেরক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিশ্ব-

নীতির নেপথ্যে যে কুটিল শক্তির ক্রূর রসিকতা দেখে ক্ষোভে যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছিলেন, এই গল্পে সেই স্বরই অনুরণিত। বিচিত্র এই সৃষ্টি— বিচিত্রতব এর প্রথা-পদ্ধতি। সংসারের পক্ষে যে গ্লানিস্বরূপ, যাঁর বেঁচে থাকার অর্থই হল হিংসায়, লোভে স্বার্থপরতায় চারদিক আবিল করে তোলা— জীবনের অধিকার সে-ই লাভ করে। আর যে সুন্দর দেবপুষ্পের মতো শুচি-নির্মল— মৃত্যু তাকেই সর্বাগ্রে হনন করে। 'ঈশ্বর যাকে ভালো-বাসেন তাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করেন'—এই প্রবাদের পবিপূরকই 'পুন্নাম' গল্পে যেন নিষ্পন্ন করা হয়েছে- ঈশ্বর যাকে একান্তভাবে ঘৃণা করেন- তাকেই দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ দান করে থাকেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশিত কূট ঐশীশক্তি পৃথিবীতে পবিত্র সৌন্দর্যকে সহ্য করতে পারে না; তার বিধানে সেই কুৎসিত হীন-স্বার্থপরতাই প্রাণের অধিকার লাভ করে—যে মানুষের দুঃখকে দুঃসহতম করে তুলবে, তার পাপকে আরো বীভৎস করে দেবে, তার যন্ত্রণাকে আরো প্রলম্বিত করে দেবে, তার মুক্তির চতুর্দিকে পাকে পাকে আরো কঠোর দুশ্ছেদ্যতম শৃঙ্খল জড়িয়ে দেবে।

কিন্তু তবু প্রেমেন্দ্র মিত্র আশা ছাড়েন নি। কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের আশা আছে, একদিন পঙ্কবিমন্থন শেষ হয়ে নব জীবনের তিমিরহারী সমুদার অভ্যুত্থান ঘটবে—জীবধাত্রী মৃত্তিকা সেই দিনের জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছেন। 'পুন্নামে'র ললিতের ভাবনার মধ্যে তা-ই

অভিব্যক্ত হয়েছে : "বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধরে বার বার আশাহত ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি।'

এবং তাই যদিও আপাতত 'হৃদয়ের পথে কঙ্কালগুলি চলে, বাসর-রাতের দীপ নিভে গেছে বিধবা নয়ন জলে', তবু কান পেতে কবি শুনতে পান 'জীবনের উন্মত্ত কল্লোল'। সেই 'কল্লোলের' না হোক কুলুকুলু ধ্বনিও প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের শুনিয়েছেন অন্তত দুটি গল্পে : 'পাশাপাশি' এবং 'সাগর সঙ্গম।'

প্রথম গল্পটি প্রতিবেশী দুটি ভাড়াটে পরিবারের অপরূপ বাস্তব চিত্র। সমস্ত হীনতা-দীনতার মধ্যেও মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মমত্ব ও সমাত্মতার অনুভাবে গল্পটি আমাদের স্নিগ্ধ করে—শরৎচন্দ্র-সুলভ একটি কোমল মাধুর্য বিস্তার করে দেয়। মেজ বৌয়ের চরিত্রে 'মেজদিদি' হেমাঙ্গিনীর আরো সংযত ও পরিচ্ছন্ন রূপায়ণ দেখতে পাই। 'সহজ সুরে সহজ কথা' বলবার আর্ট গল্পটিতে লক্ষণীয়।

'সাগর সঙ্গম' প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প কিনা জানি না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো দশটি শ্রেষ্ঠ গল্পের এটি অন্যতম, সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। এক-একটি ছোটগল্প দিয়ে এক-একজন লেখককে চিহ্নিত করতে গেলে মপাসাঁর যেমন 'Necklace', শেকভের যেমন 'Darling', ব্যালজাকের যেমন 'Passion in the Desert', ও' হেনরির

যেমন 'The Gift of the Magi', গোর্কীব যেমন 'Birth of a Man', হেমিংওয়ের যেমন 'The Light of the World', গ্রাহাম গ্রীনের যেমন 'The End of the Party', রবীন্দ্রনাথের যেমন 'তুরাশা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন 'আত্মহত্যার অধিকার'—তেমনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গম।'

'সাগব সঙ্গম' পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি মনে পড়তে পারে। কিন্তু ভাবগত একটি ঐক্য ছাড়া এই তুটির মধ্যে আর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। 'অনধিকার প্রবেশে' রবীন্দ্রনাথ সূত্রাকাবে লোকধর্মের ওপব মানবধর্মের যে প্রতিষ্ঠাব ইঙ্গিত করেছেন—তাকে অবলম্বন করেও প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বতন্ত্রতব মহিমক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের মধ্যে মাতৃত্বেব কোমল স্পর্শ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে গণিকার কন্যা বাতাসীর মাধ্যমে এই নরকবাসিনী নারীদের প্রতি তাঁর অভ্যস্ত সমবেদনাও বিতরিত হয়েছে—পঙ্কজা যে মাতৃস্নেহেব সূর্যস্পর্শে পদ্মকলি হয়ে উঠতে পারে বাতাসীর দ্রুত এবং পরিবেশগত পরিবর্তনে তারও সংকেত আছে।

একদিকে পরিবেশ-রচনায় লেখকের বাস্তব চেতনা এবং কবি-কুশলতা, অন্যদিকে নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা দাক্ষায়ণীর সর্বলোকাচারমুক্ত মাতৃত্বের বোধনে প্রেমেন্দ্র মিত্র রাবীন্দ্রিক চেতনার উদারতম ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছোটগল্পের বিচারে 'সাগর সঙ্গম' একটু বিস্তীর্ণ—কিন্তু এই বিস্তৃতি একমুখিতা ও

এককেন্দ্রিকতাকে বিচলিত করে নি। শৈল্পিক সিদ্ধিতে গল্পটির আদ্যোপান্ত সমুজ্জ্বল—এর ফলশ্রুতিতে মানব প্রেমের কল্যাণ-স্নিগ্ধ অভিব্যঞ্জনা। এই একটি গল্পই বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সুচিরস্থায়িত্ব দিতে পারত।

আর এই গল্পটি পড়লেই মনে হয়, সর্বংসহা পৃথিবীর সত্যিই ধৈর্যচ্যুত হওয়ার কারণ ঘটে নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন 'আমি মানুষের কবি'— পৃথিবীর সমস্ত সফলতম শিল্পীর মতোই তাঁর সাধনাও মানবতার সাধনা। এই গল্পের বিন্দুতে সেই সাধনার সিন্ধু-সংকেত আছে।

ঠিক কথা। জীবন মিথ্যা নয়, মানুষ পশু নয়। তবু হয়তো এখনো লগ্ন অনাগত—এখনো হয়তো অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সে অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়ার নয়। মানুষের হৃদয় একদিন জাগবেই, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত বাধা এবং সমস্ত গণ্ডি সেদিন নিঃশেষ বিলুপ্ত হবে।

কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা।

॥ ৪ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতির অনেকখানিই তাঁর মনস্তত্ত্বমূলক ছোট-গল্পগুলির ওপরে নির্ভরশীল। বস্তুত অন্তর্মুখীনতা এবং মনো-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের ওপরেই যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের শক্তির প্রধানাংশ পরিমাপ করা যায়। অন্তর্লোকের এই চেতন,

অবচেতন এবং স্বপ্ন-জাগর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে হোমারের বহির্মুখী ইউলিসিসের মতো জেম্‌স্ জয়েসের উপন্যাসও এপিক হয়ে উঠতে পেরেছে। মনের চাইতে বড় অবণ্য কঙ্গোপ্রদেশ কিংবা অ্যামাজনের তীর কোথাও নেই—অন্তরের অতলান্ত গভীরতার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরও হার মানে।

আর মানুষের সামাজিক সত্তা? তার বহিঃপ্রকাশিত রূপ? তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের তা এক সহস্রাংশও নয়, হয়তো তার চাইতেও কম। একটা উপমা দিয়ে বলা যায়, সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যখন কোনো আইস্‌বার্গ ভেসে চলে, তখন তার সামান্য অংশই চোখে পড়ে এবং যে-টুকু চোখে পড়ে তা-ও কুয়াশায় আবৃত। কিন্তু যে মুহূর্তেই তার কারো সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে তখনই তার শক্তি এবং বিশালত্ব আভাসিত হয়ে ওঠে।

এ-যুগের সাহিত্য সেই গভীবসঞ্চারী পূর্ণতর ব্যক্তিত্বেরই সন্ধানী। ফরাসী কথাশিল্পীদের হাতে এই গূঢ় জিজ্ঞাসা প্রথম সাহিত্যীকৃত হতে আরম্ভ হয়। তারপর থেকেই সামাজিক জীবনে ও লোকব্যবহারে পরিচিত খণ্ড-মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ সত্তাকেই আবিষ্করণের প্রয়াস শুরু হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনো-বিজ্ঞানের যত সংযোজন ও পরিমার্জনই হোক না কেন—সেখান থেকেই বর্তমানকাল যে মনোগহনের দীপবর্তিকা লাভ করেছে তাতে মতদ্বৈধ নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর কয়েকটি সার্থক ছোটগল্পে এই মানস-তমসার মধ্যে পরিক্রমা করেছেন।

এই জগৎ আশ্চর্য। এখানে একান্ত পশুর মধ্যেও এক টুকরো ভালোবাসা হীরার মতো ঝলমল করে, আপাতদৃষ্ট দেবচরিত্র নিজের অজ্ঞাতেই চেতনার নেপথ্যলোকে বীভৎসতম বর্বরকে বহন করে। এখানে গোপন কামনা নিভৃত রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিসর্পিত হয়ে চলে, হিংসা ও কূটৈষণা ক্রিমিকীটের মতো কিলবিল করে, লোভ এখানকার পঙ্ককুণ্ডে বুদ্বুদ তোলে, বিকৃতি এখানে নখদন্ত শাণিত করে শিকার-সন্ধানী জন্তুর মতো প্রতীক্ষা করতে থাকে। রুক্ষ আবরণের অন্তরালে স্নেহ-মমতা এখানে পাতালগঙ্গার মতো উচ্ছলিত হতে থাকে।

অবশ্য 'ন্যাচারিলজ্‌ম্‌' থেকে শুরু করে 'ডাডা-ইজ্‌ম', 'সুর-রিয়্যালিজ্‌ম্‌' পর্যন্ত সর্বত্রই মনঃসমীক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যগত পশুত্ব ও বিকৃতিই যেন একমাত্র উদ্‌ঘাটনযোগ্য হয়ে উঠেছে। বহুকাল আগে দার্শনিক হব্‌স্‌ বলেছিলেন, মানুষের মৌল উপাদানই হল পশুতা ও স্বার্থপরতা—সুতরাং তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কড়া অভিভাবক (Leviathan) দরকার। মানুষ-সম্পর্কিত এই ঘৃণাত্মক দৃষ্টি দুঃখবাদী দার্শনিকদের হাতে আরো চরম রূপ লাভ করেছে এবং যেটুকুও বাকী ছিল, ফ্রয়েডের 'লিবিডো'তত্ত্ব তাকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে।

সুতরাং স্বভাবতই, পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই মনোগহনের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে মানুষের এই মৌলিক পশুত্বকে স্পর্শ করেছেন। কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। পশুর আদিমতার মধ্যে কোথাও কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা বাধাবন্ধনের অবকাশ নেই,

তা সরলরেখায় চলে। মানুষের দুর্ভাগ্য আরো বেশি। সে সামাজিক জীব বলে, তাকে দিবারাত্র সমাজ-পরিবার-রাষ্ট্র-সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হয় বলে এবং মানুষ হিসেবে তার নিজস্ব একটা অহমিকা আছে বলে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাকে মৌল পাশবিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, অবদমন (Repression)-কে আশ্রয় করতে হয় এবং নিজের মনের মধ্যে রণক্ষেত্র তৈরি করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে হয়। আদিম-শক্তিরা সব সময় সমূলে উৎপাটিত হয় না—পরাভূত হিংসায় তারা লুকিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করে, মনুষ্যত্বের বর্মচর্মধারী প্রহরী মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলেই ক্ষুধিত নেকড়ের মতো তার ওপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এই ভয়ঙ্কর জগতের ভয়াবহ প্রকাশ ঘটেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলমেও এই হিংস্রতার রূপ চমৎকারভাবে ধরা দিয়েছে 'হয়তো' গল্পটিতে। গভীর দুর্যোগের রাত্রিতে একটি ভাঙা সেতুর ওপবে গল্পটির নাটকীয় সূত্রপাত, স্ত্রীর হঠাৎ নদীতে পড়ে যাওয়া এবং স্বামীর সন্দেহজনক আচরণের মধ্যে এর ব্যঞ্জনা। লেখক একটি নতুন টেক্‌নিকের আশ্রয় নিয়েছেন গল্পটিতে, যেন উত্তমপুরুষরূপে এই সূচনাপর্বটুকু পর্যবেক্ষণ করে তারপর বাকী অংশটুকু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করে দিয়েছেন। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। টেক্‌নিকের এই চাতুর্যটুকু গল্পটির আস্বাদনে গণনীয় নয়।

গল্পের সূচনাতেই দুর্যোগ রাত্রির সঙ্গে মন মিলিয়ে হত্যার

যে প্রেরণায় মহিম উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, নিয়োগীদের ভূতুড়ে বাড়ির মতো বিশাল ভগ্নপ্রাসাদ এবং নববধূ লাবণ্য ব্যতীত বাড়ির অবশিষ্ট তিনটি প্রাণী পূর্ব থেকেই সেই হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকা রচনা করেছে। গল্পটির আর একটি বিশেষত্ব এই নিয়োগী বাড়ির মূল তিনটি চরিত্রের মধ্যে কোনোটিকেই লেখক স্পষ্ট করে আঁকেন নি : পিসিমার 'শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখ', রাক্ষসী ছলনার মতো মাধুবীর অপরূপ রূপ ও উচ্ছলিত হাসির প্রবাহ এবং মহিমের সরীসৃপ সন্দেহের বিষ—সব যেন আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করছে। তারা মানুষ কিনা তা-ই সন্দেহ হয়। গল্পটি পড়তে পড়তে এডগার অ্যালান পো-র 'হাউস্ অব্ দি আশারস্' যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে; অথবা কাউণ্ট্ ড্রাকুলার সেই প্রেতপুরীর বীভৎসতম কাহিনীটি মনে পড়ে—পাঠক অনুভব করেন, এই গল্পের মানুষগুলিও বহুকাল আগে মরে পিশাচ হয়ে গেছে, তাদের এখন একমাত্র কাজ হল জীবন্ত মানুষকে ভুলিয়ে এনে তার রক্ত শুষে খাওয়া।

গল্পের শেষ দিকে, এই প্রেতপুরীর বাইরে লাবণ্যকে নিয়ে বেরিয়ে এসে মহিম যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে মানুষ হয়ে উঠে-ছিল। তারই পরে এল রাত, এল দুর্যোগ, উপযুক্ত সুযোগ নিয়ে দেখা দিল ঝড়ের দোলালাগা নদীর ওপরে ভাঙা পোল, সেখানে মুহূর্তের অসতর্কতার পরিণাম মৃত্যু। মহিমের ভেতর থেকে আবার আত্মপ্রকাশ করল সেই পিশাচ—লাবণ্যকে সে

নদীর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। সে যাত্রায় লাবণ্য হয়তো রক্ষা পেল, কিন্তু এ তো কেবল আরম্ভ -শেষ নয়। তাই গল্পের শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন "হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।"

'হয়তো' ভৌতিক গল্পের মতো অস্বস্তিকর—আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনতে চায়। কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো, সন্দেহ-পরায়ণ স্বামীর 'কম্‌প্লেক্সের' অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করেও পরিবেশ রচনার কৌশলে এবং চরিত্র চিত্রণের বৈশিষ্ট্যে গল্পটি এমন অনন্যতালাভ করেছে। আমার মনে হয়, মনস্তাত্ত্বিকের নৈপুণ্যের চাইতেও এই গল্পে কবির কৃতিত্ব বেশি—কবিমননসুলভ emotional excess এবং বর্ণনার ঐশ্বর্যই গল্পটিকে এই অসাধারণত্ব দিতে পেরেছে। বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বাশ্রয়ী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পটভূমি ও বিবৃতির আশ্রয় নিতেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

এ অনুমান সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতা এবং কবিকল্পনা অনেক সময় এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেছে যে যাকে আমরা মানসিক বিসপিলতা বলে অনুমান করছি, মূলত তা কল্পনারই সম্প্রসারণ। কবি-গল্পকারের হাতে Imagination সহজেই Psycho-analysis-এর রূপ ধরতে পারে এবং তাদের পার্থক্য নির্দেশ যে সব সময়ে সহজ হতে পারে তাও নয়। মনোবিজ্ঞানের অনুবীক্ষণে যেমন বীজাণু ধরা পড়ে, তেম্‌নি কল্পনাও কতগুলো অদ্ভুত ছায়ামূর্তি রচনা

করে তাদের অন্তর্লোকের অবচেতনারূপে উপস্থিত করতে পারে। 'শৃঙ্খল' গল্পটি সম্বন্ধে সে সংশয় জাগে।

এটিও অত্যন্ত সুলিখিত গল্প। ভূপতি এবং বিনতির মধ্যে এক অদ্ভুত দাম্পত্য-সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন লেখক : "প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল জীবনের কি আশ্রয় ?"

আপাত দৃষ্টিতে 'শৃঙ্খল' গল্পটির মনস্তাত্ত্বিকতা প্রায় বিশ্বাস-যোগ্য, কিন্তু একটি প্রশ্নও সেই সঙ্গে থাকে। বস্তুত, মানুষের জীবনে "বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে বাঁধা" এই দাম্পত্য সম্বন্ধটি কি মনস্তত্ত্ব-গ্রাহ্য ? ঘৃণার বন্ধনে কি স্বামী স্ত্রী এইভাবে বাঁধা পড়তে পারে, বেঁচে থাকতে পারে ? এর বিপরীতটিই কি সত্যি নয় ? মনে হয়, এখানে মনোবিকলনের চাইতে কবি-কল্পনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে—সত্যের চাইতেও সত্যতর কিছু আভাসিত হয়েছে। এই সংশয় সত্ত্বেও গল্পটির নৈপুণ্য অবশ্য-স্বীকার্য।

মননমূলক কাহিনীর সার্থকতম নিদর্শন সম্ভবত 'ভস্মশেষ।' গল্পটি আশ্চর্য। অত্যন্ত সংযত ও ইঙ্গিতমূলক এই গল্পটি ত্রিকোণাকার—জগদীশ বাবু, তাঁর স্ত্রী সুরমা ও ডাক্তার অমরেশ। গল্পের পটভূমি পাহাড় বনাঞ্চলের একটি বাংলো-জাতীয় বাড়ি।

অমরেশ সুরমাকে পায় নি তার পরিবর্তে জগদীশ বাবুর সঙ্গে সুরমার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু অমরেশ আশা ছাড়ে নি। অসীম দুঃসাহসে সে ছুটে এসেছে জগদীশ বাবুর আরণ্য-আবাসে, বাসনা—একদিন সেখান থেকে সুরমাকে সে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। সুরমারও সম্ভবত তাতে আপত্তি নেই।

কিন্তু আশ্চর্য। দিনেব পব দিন কেটে গেছে—পার হয়ে গেছে বছরের পর। সে সুযোগ কিছুতেই আর আসে নি। অথচ, অমরেশ নিয়মিত হাজিবা দেয়, সুবমা এখনো তেমনি আছে—কিন্তু সংকল্প আর কাজে পরিণত হয় নি। যে কামনা ও বিদ্রোহের আগুন বুকে নিয়ে অমরেশ এখানে এসেছিল সে আগুন বহুদিন নিবে গেছে—এখন দৈনন্দিন আসা-যাওয়া করা, সুরমার ফাই-ফরমাস খাটা—সব কিছু অমরেশের নিছক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। "বড় বেশিদিন অপেক্ষা করেছে সে"—এখন যা আছে তা 'ভস্মশেষ' ছাড়া আর কিছুই নয়।

'ভস্মশেষ' গল্পের আসল ট্র্যাজেডী সুরমাকে নিয়ে ডাক্তারেব পলায়নের অক্ষমতার মধ্যে নেই; কালের ক্রমক্ষয়ে প্রেম ও বিদ্রোহের যে জীর্ণতাগ্রস্ত অপঘাত ঘটেছে, এর বেদনা সেইখানেই। একটিমাত্র ভুল করেছিল অমরেশ—সে জোর খাটাতে পারে নি, আদিম মানুষের মতো অধ ইচ্ছুক বাসনা-বাসিনীকে সে বাহুবলে ছিন্ন করে নিয়ে যায় নি। শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প লেখকের নৈপুণ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই এই গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন এইভাবে: "কখন আর-বছরের পাপড়ির মতো সে

ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে—জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধুলোয়।"

'ভস্মশেষ' অবিস্মরণীয় গল্প।

মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্প হিসেবে আরো দুটির উল্লেখ করা চলে। একটি 'ভূমিকম্প' অপরটি 'স্টোভ'।

'ভূমিকম্পের' সঙ্গে 'শৃঙ্খল' গল্পের কিছু ভাবগত সাধর্ম্য আছে। শশাঙ্কের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মালতী স্বামীকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে নি- দেওয়ালে টাঙানো প্রথমা স্ত্রীর ছবি তার মনে শশাঙ্কের প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করেছে। শশাঙ্ক তাকে কোনোমতেই পায় না—মালতী সম্পর্কে একটা দুর্বোধ সন্দেহে সে-ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এক ভূমিকম্পের রাত্রে যেদিন ছবিটি দেওয়াল থেকে খসে পড়ল, সেই প্রলয়-লগ্নে দুজনের ক্ষণ-মিলন ঘটেছিল। কিন্তু অচিরাৎ ভূমিকম্প থেমে গেল—বিশ্লিষ্ট হল মালতী, দেখা গেল, ছবির শুধু কাচই ফেটেছে—আর কিছুই হয় নি।

'ভূমিকম্প' গল্পটির বৈশিষ্ট্য এর ইঙ্গিতধর্মিতায়। প্রথমা স্ত্রীর ছবিটি এতে প্রতীকের কাজ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সুগভীর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। অনুরূপ প্রতীক হচ্ছে 'স্টোভ'।

একাধিক মননমূলক গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র দাম্পত্য জীবনকেই আশ্রয় করেছেন এবং যে-সমস্ত মনোবিকার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

ব্যবধান রচনা করে, তারই সংকেত দিতে চেয়েছেন। 'স্টোভ' গল্পেও স্বামীর অবিবাহিত জীবনের বাঞ্ছিতা মল্লিকাকে নিয়ে সংশয় ও বিদ্বেষ বাসন্তীর মনে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে—একটি পুরোনো অব্যবহার্যপ্রায় স্টোভ যা যে-কোনো মুহূর্তেই ফেটে যেতে পারে— তার "উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন" যেন বাসন্তীর অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসছে। এই 'স্টোভ' বাসন্তীরই জীবনের প্রতীক– কখন এ-বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে তারই জন্যে ভয়ে আর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে বাসন্তী। "কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না"— অথচ সে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাসন্তীর নিষ্কৃতি নেই। মল্লিকার কাছে কিছুতেই সে হার মানবে না, অথচ সেই পরাজয়ই আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে 'স্টোভ' আর একটি সার্থক সৃষ্টি।

॥ ৫ ॥

কিন্তু গল্প-সাহিত্যে আরো একটি পরিচয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের আছে। সে কবির পরিচয়।

'একরাত্রি' 'ক্ষুধিত পাষাণে' যেমন কবি রবীন্দ্রনাথ কোথাও আত্মগোপন করেন নি, তেম্‌নি প্রেমেন্দ্র মিত্রও রোম্যান্টিক্ আনন্দের মধ্যে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন কিছু কিছু গল্পে। তাদের কয়েকটি হল, 'রবিন্‌সন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন',

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'সহস্রাধিক দুই', এবং 'ময়ূরাক্ষী'। 'জ্বর' গল্পটিও উপভোগ্য।

রোম্যান্টিকতার মধ্যে দূরাভিসারের যে উদ্দাম একটি আকুলতা আছে—প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ও কিশোর-সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রয়েছে। "কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে, খোরাসান থেকে বাদক্শান, পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান"—প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনা ছুটে বেরিয়েছে, 'আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু'র ডাক তাঁর কানে এসেছে: "হে-ইডি, হাইডি, হা-ই।" কখনো কখনো এই কল্পনার মধ্যে অন্যতর তাৎপর্য নিহিত থাকলেও তাঁর সুদূরচারী স্বপ্নাকুলতাও এদের সঙ্গে বিজড়িত। আর তারই অভিব্যক্তি 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো মেয়ে ছিলেন'।

গল্পের বক্তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিশোর-সাহিত্যের স্বনামধন্য ঘনাদা—ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান মিশিয়ে আজগুবী গল্প বানাতে যাঁর জুড়ি নেই। কিন্তু ঘনাদা বা ঘনশ্যামবাবুর মুখে গল্পটি বিবৃত হলেও এর রস আলাদা এর স্বাদ গভীরতর। মধ্য-যুগীয় রোমান্সের ভিত্তিতে অপরূপ-সুন্দর এই গল্প, বর্ণনায়, ভাষার কারুশিল্পে এবং কল্পনার কুশলতায় 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করবার যোগ্য। রাইডার হ্যাগার্ডের ক্লাসিক উপন্যাস "She" থেকে লেখক হয়তো গল্পটির প্রেরণা পেয়ে থাকবেন, কিন্তু তাতে এর মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। প্রোলোগ্ এবং এপিলোগ্ বাদ দিয়ে মূল গল্পটি

কবিতার মতো সুন্দর- সি হুয়ানের জন্যে নান সু-র ব্যাকুল প্রতীক্ষা অপূর্ব কোমল মাধুর্যে অভিষিক্ত। বিদ্যাবত্তার সঙ্গে কল্পনার সার্থক সমাবেশ এর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর পরিণামে সি-হুয়ানের বংশধরদের হাতে হ্যাগার্ডের "শী"র মতোই জরতী নান-সু-র অগ্নিদহন যেন আর একটি তাৎপর্য বহন করে— বর্তমানের স্থূল লোভ ও লালসার আগুনে রোমান্সের স্বপ্নকমল যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—এই গল্পে সেই দীর্ঘশ্বাসই অনুভব করা যায়।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' বহুখ্যাত গল্প—সর্বজনস্বীকৃত-রূপে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। টেক্‌নিকের দিক থেকে রচনাটি যেমন অভিনব - তেম্‌নি এর বিষয়বস্তুটিও সজল-কারুণ্যে এক নিবিড় বেদনায় পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এ শুধু ছদ্ম-পরিচয় দিয়ে মৃত্যুমুখিনী বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দেওয়াই নয়—যামিনীর করুণ চোখদুটি যেন এক মুহূর্তে জীবনে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেবে—চলে আসবার সময় হৃৎস্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হবে, "ফিরে আসব, ফিরে আসব!"

কিন্তু বাস্তব এত সহজ নয়। শহরে ফিরে এসে, দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া ভোগ করে সেরে ওঠবার পরে 'তেলেনাপোতা' আর সত্য থাকবে না - তার পথ কোথায় হারিয়ে যাবে, সবই স্বপ্নের মতো মনে হবে। গল্পটির সবচেয়ে বড় সার্থকতা এই : পাঠক যেন গল্পের নায়কের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান—যামিনীর কাছে ফিরে যেতে না পারার অপরাধ যেন তাঁকেই বেদনাবিদ্ধ

করতে থাকে, একটি প্রতীক্ষমানা গ্রাম্য মেয়ের আকুল চোখের দৃষ্টি তাঁরও বুকের মধ্যে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে। গল্পটি রোম্যান্টিক্‌, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-বাংলার একটি অসহায় পরিবারের করুণ চিত্রণ একে অসামান্য করে তুলেছে। ছদ্ম-পরিচয় দিয়ে কোনো বিপন্ন মৃত্যুমুখকে সান্ত্বনা দেওয়ার কল্পনা সাহিত্যে হয়তো খুব নতুন কথা নয়, কিন্তু এখানেও কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সিদ্ধিলাভ করেছেন—গঠননৈপুণ্যে এবং কাব্যব্যঞ্জনায় 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' অনন্যস্বাদ লাভ করেছে।

'ময়ূরাক্ষী'কে সম্ভবত সম্পূর্ণ গল্প বলা যায় না – রচনাটি রূপক। 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসের আত্মগোপনকারী লেখক পতঞ্জলি নিজের এক আশ্চর্য চরিত্র। পতঞ্জলি রায় যেন তার বিচিত্র জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের বাস্তবতাপন্থীদেরই সমালোচনা করেছে। যারা 'বিকৃত বিড়ম্বিত জীবনের' কারাগারে পশুর মতো বাস করে- রিয়্যালিজমের নামে তাদের পাশবতাকে প্রকাশ করাই যে সাহিত্য নয়, পতঞ্জলি রায়ের মুখে সেই সত্যটিই অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনযাত্রার নিম্নতম পর্যায়েও মানুষ সৌন্দর্যের সন্ধানী—সমস্ত দুর্ভাগ্যের অন্তরালেও প্রেম-ভালোবাসার ফল্গু বয়ে চলে। সেই জীবনতৃষ্ণা থেকেই মানুষের কল্পনাবিলাস-- তা থেকেই উৎসারিত তার রূপকথা। রিয়্যালিজ্‌মের নামে যারা পঙ্কমন্থন করে, তারা এই পরম সত্যটিকেই ভুলে থাকে। পতঞ্জলি রায় তাই বলেছে :

"মানুষ একদিন আশ্চর্য সব রূপকথা তৈরী করেছে। সে কি

শুধু মিথ্যার মৌতাতে বুঁদ হয়ে, যা বাস্তব তাকে ভুলিয়ে দেবার ও ভুলে থাকবার জন্যে? সে রূপকথার মধ্যে সেই দুঃসাহসী আশার বর্তিকা কি নেই, বিকৃত বর্তমানকে অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ ক'রে ভবিষ্যতের সঙ্কেত যা বহন করে। জীবনকে তার সমস্ত কদর্যতা, গ্লানি আর অসম্পূর্ণতা নিয়ে সত্য ক'রে জানবার দুর্ভাগ্য যাদের হয়নি, বাস্তবতার ফাঁকা বুলির হুজুগে তারাই সব চেয়ে মেতে ওঠে। জীবনকে সত্য ক'রে যে জেনেছে, সে সত্যের চেয়ে আরও বেশি-কিছু দিয়ে তা প্রকাশ করে; সেই বেশি কিছুই হল মানুষের স্বপ্ন।"

এ কি কেবল পতঞ্জলি রায়েরই কথা? সম্ভবত বাস্তব জীবনের নৈষ্ঠিক রূপকার এবং অন্যদিকে স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও নিজের সম্পর্কে এ-ই হল জবানবন্দি।

প্রেমেন্দ্রের আঙ্গিক সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবু সব শেষে বলা দরকার, তার গল্পগঠনকৌশল তাঁর কবিতার মতোই সংযত, ঘনপিনদ্ধ এবং তির্যক্। ভাষা নির্বাচনে তাঁর ঈর্ষ্যাযোগ্য সতর্কতা। পুনরুক্তি করে বলতে পারি বহিরঙ্গ রচনায় রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দোপাধ্যায় সফলতম শিল্পী।

পঞ্চম প্রসঙ্গ

পশু, প্রেম, ধ্রুবতারা

[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়]

॥ ১ ॥

"বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর।' ৩৪ সালের ফাল্গুনের কল্লোলে রসকলি প্রকাশিত হওয়ায় ষাণ্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলাম। হারানো সুর প্রকাশিত হল এক মাস পরে; তখন সম্পাদক জানালেন, আমাকে আর কল্লোলের জন্য মূল্য দিতে হবে না, কল্লোল আমি নিয়মিত পাব এর পর থেকে। সুতরাং এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব।"*

ছোটগল্প লেখক রূপে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কি ভাবে প্রথম আবির্ভূত হলেন—তার সম্পর্কে এ-ই তাঁর নিজস্ব বিবরণী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলে দিয়েছেন, "আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে, প্রদীপ জ্বালবার আগে যেমন সলতে পাকানো।" তাই প্রত্যেক লেখকেরই সাহিত্যযাত্রা শুরু করবার আগে একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকে।

*আমার সাহিত্য-জীবন, পৃঃ ৯

প্রথমে লেখক হয়ে পরে তিনি নিজের বক্তব্য নির্ণয় করেন না —তাঁর বক্তব্যের প্রেরণাই তাঁকে লেখকত্ব দান করে কতগুলি বিশেষ অনুভূতি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর কতগুলি একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি (Realisation) তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে—তাই তাঁর Inspiration—তারই ভিত্তিতে তাঁর শিল্পরূপ গড়ে ওঠে। জাত শিল্পীর ধর্মই তাই। অবশ্য এমন লেখকও আছেন- যিনি চমৎকার করে বলতে জানেন অথচ যাঁর বলবার কথা কিছু নেই। এঁদের কারুকলা হয়তো সামসময়িক কালের কাছ থেকে কিছু নগদ বিদায় পেতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তা মনে রাখে না। তার প্রমাণ মরিস ডেকোব্রা Madonna of the Sleeping Car-এর 'হটকেক্ সেলার' এর মধ্যেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়েছেন।

যে-কোনো বড় শিল্পীই প্রেরণায় অঙ্কুরিত, সাধনায় পল্লবিত এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ফলবান্। প্রতিটি মহৎ সৃষ্টিই এই অর্থে ত্রিগুণাত্মিক। এই জন্যেই কোনো শিল্পস্রষ্টাকে উপযুক্ত ভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর প্রেরণার উৎস, সাধনার পরিমাণ এবং দার্শনিকতার স্বরূপ মোটামুটি বুঝে নিতে হয়। গল্পকার তারাশঙ্করকেও এই ভাবে আমাদের কিছুটা জেনে নেওয়ার দরকার আছে। তার সুযোগও তারাশঙ্কর আমাদের দিয়েছেন তাঁর একাধিক আত্মকথামূলক রচনায়— অন্তত "আমার সাহিত্য জীবনে" তাঁর মানসক্ষেত্রের অনেকখানি সংবাদ আমরা পাব।

সাহিত্য জীবনের পূর্বেই তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের উৎসাহী কর্মীরূপে বীরভূমের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর আগেই তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। সে পরিচয় রাজনৈতিক আদর্শে সমুজ্জ্বল, জীবনপ্রেমিক শিল্পীর মমতায় সুস্নিগ্ধ। নাট্যকার হওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থকাম আশাহত তারাশঙ্কর কলকাতার রঙ্গ-মঞ্চের ওপর অভিমান করেছিলেন —কিন্তু দেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁর অভিযোগ ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পের ('পোনাঘাট পেরিয়ে') একটা আদিম অমার্জিত রস এবং শৈলজানন্দের কলমে বীরভূমের অপূর্ব রূপায়ণ তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করল, স্থানিক 'পূর্ণিমা'র ছোট গণ্ডিটি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি 'কল্লোলে' তরাঙ্গত হলেন।

সূচনার উদ্ধৃতিটিতে 'কল্লোলে' প্রকাশিত তাঁর তুটি গল্পেরই নাম করা হয়েছে। 'রসকলি' বা 'হারানো সুর' পড়লেই বোঝা যাবে লেখক বাংলার পল্লীজীবনের সহজ সুরের মধ্যেই তাঁর প্রেরণাকে খুঁজে পেয়েছেন। গ্রামের বৈষ্ণবীর খঞ্জনীর ঝঙ্কার কেমন করে তাঁর লেখক-সত্তাকে জাগিয়ে দিলে, সে-সম্বন্ধে লেখকের স্বীকারোক্তি এই :

"গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মতো জীবন নিয়ে ফুটল।

শুধু আমার গল্পের মঞ্জরীই ফুটল না - আমার মনে হল,

আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম।" (আমার সাহিত্য জীবন, ২১ পৃঃ) এ-ই যে তারাশঙ্করের সোনার কাঠি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাউলের একতারা আর মাঠের বাঁশির যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তারাশঙ্করের সাহিত্যে তা-ই মুখ্য হয়ে উঠল। এই জন্যেই তারাশঙ্কর 'কল্লোলে'র লেখক-গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও ঠিক সম্পূর্ণ 'কল্লোলে'র হতে পারলেন না। চরিত্রধর্মের দিক থেকে 'কল্লোল' ছিল নাগরিক—শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতাবোধ এবং গ্লানির সঙ্গে নিরুপায় বিদ্রোহ-প্রয়াসেই 'কল্লোলের' বৃত্তরেখা নির্দিষ্ট। কিন্তু পল্লীপ্রাণ, রাজ-নৈতিক কর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মোটের ওপর গ্রামীণ ঐতিহ্যে বিশ্বাসবান্ তারাশঙ্কর কোনো দিনই প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, গোকুল নাগ, মণীশ ঘটকের সগোত্রায় ছিলেন না। বুদ্ধদেব বসুর ওপরে পুরোপুরি বিজাতীয় বৈদেশিক প্রভাব কখনো তারাশঙ্করকে আত্মীয়তায় আহ্বান করে নি—শৈলজানন্দের গল্পে গ্রামীণ পটভূমি থাকলেও তার সমস্যা বা সংঘাতগুলো ছিল নাগরিক মনন থেকে আরোপিত। তাই তারাশঙ্কর "অস্থানে পততাম্" না হলেও যে ঠিক যথাস্থানে পতিত হয়েছিলেন এ কথা বলা যায় না।

অথচ 'কল্লোল' ছাড়া আর কোথায়ই বা তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন? তাঁর গল্পে যে একটা নতুন স্বাদ—জল-মাটি-মানুষের যে অন্তরঙ্গ অভিনব পরিচয়—যে অপরিচিত বিচিত্র

মানুষের আদিমতার বার্তা—তাকে আর কে পরিবেশন করতে পারত ? 'কল্লোল' সমাদরেই আহ্বান জানিয়েছিল– ঔদার্যের পটভূমিতে সে-ই নতুনকে অভিনন্দন জানাতে পেরেছিল। তবে 'কল্লোলে'র মনোধর্মের সঙ্গে তারাশঙ্করের যে একটা সূক্ষ্ম সহবোধ যে না ছিল, তাও নয়। সে-কথা যথাকালে আলোচ্য।

এর পরেই অসহযোগ আন্দোলনে (১৯৩০ সালে) তারাশঙ্কব কারাবরণ কবলেন। কিন্তু এই কারা-জীবনই বলতে গেলে যথার্থ ভাবে তাঁর সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করল। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে স্বভাবতই যে দলাদলি, মতান্তর ও মনান্তর আছে, তা তারাশঙ্করকে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করে তুলল। জীবনসংবেদনশীল শিল্পীরূপে যে humanitarian দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি দেশকে দেখেছিলেন, দলাদলির সংকীর্ণতায় তাঁর সেই আদর্শ-চেতনা বিচলিত হল। তিনি কারামুক্তির মুখেই সহকর্মীদের কাছে ঘোষণা করলেন, এর পর থেকে তাঁর পথ আর রাজনৈতিক দলীয়তায় নির্দেশিত হবে না : তিনি মানবিক সত্যের আদর্শে অগ্রসর হবেন—এখন থেকে সাহিত্যই হবে তাঁর দেশপ্রেমের বাণীবহ।

জেলখানাতেই তারাশঙ্কর "চৈতালী ঘূর্ণি" এবং "পাষাণপুরী" উপন্যাস দুখানির পত্তন করেছিলেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতির পথ প্রশস্ত হল। 'কল্লোলে'র প্রধানতম শিল্পীরা জীবন সম্বন্ধে নেতিবাদী মনোভঙ্গির জন্যে কোনো স্থায়ী

মহৎ উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি, অনেকগুলি চমৎকার ছোটগল্পের বিদ্যুদ্‌বিকাশেই তাঁরা নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ ও মানুষের প্রতি রাজনৈতিক চেতনা-সমুত্থ গভীর মমত্ব এবং স্বজনত্ববোধ তারাশঙ্করের রচনায় একটি নির্দিষ্ট জীবন-দর্শনের ব্যাপ্তি এনে দিল। "রাইকমলের" সাফল্য "ধাত্রীদেবতায়" আরো বেশি পূর্ণতা লাভ করল, "কালিন্দী" "গণদেবতা" "কবি"—তাঁকে যশের বাঞ্ছিত ভূমিতে পৌঁছে দিল। বর্তমান কালে বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনিই সব চাইতে মহিমোজ্জ্বল।

গল্পকাররূপেও তারাশঙ্কর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে সমুদ্ভাসিত। তাঁর সেই রূপটিই আমাদের আলোচ্য।

॥ ২ ॥

তারাশঙ্করের রচনা আঞ্চলিক। অবশ্য যে-কোনো শিল্পীর ওপরেই তাঁর নিজস্ব অঞ্চলের কম-বেশি প্রভাব থাকে। যাযাবর শরৎচন্দ্রও হুগলী জেলার গ্রাম্য পরিবেশকেই তাঁর প্রধানতম পটভূমিরূপে নির্বাচন করে নিয়েছেন। অনেকে আবার সচেতন ভাবে আঞ্চলিকতার প্রভাব এড়িয়ে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করেন এবং তাতে সফলও হন। কেউ কেউ বা কল্পনার জন্যে দুটি কি তিনটি লীলাভূমি নির্বাচন করে রাখেন। কিন্তু তারাশঙ্কর এদিক থেকে একব্রতী। নিজের পরিচিত আঞ্চলিক

সীমানাকে তিনি পারতপক্ষে অতিক্রম করতে চান নি। যেখানে করেছেন সেখানেই তাঁর কল্পনা আড়ষ্ট ও সংকুচিত হয়ে গেছে—তাঁর লেখার মধ্যে একটা স্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়। তার প্রমাণ "ঝড় ও ঝরা পাতা" কিংবা "মন্বন্তর"। উচ্চস্তরের সাহিত্য-কীর্তিরূপে বই দুটির মূল্য খুব বেশি নয়। গ্রামীণ তারাশঙ্কর এই মানসিক কুণ্ঠার সব চেয়ে বড় স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর "নাগরিক" উপন্যাসে—কলকাতার পরিবেশে আরব্ধ এই রচনাটি 'পূর্বাশা' পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে হতে অর্ধপথেই থেমে গেছে। তারপরে বোধ হয় সাত-আট বৎসর হতে চলল, তারাশঙ্কর উপন্যাসটি আর শেষ করেন নি, ভবিষ্যতে যে কোনো-দিন করবেন, তাও মনে হয় না।

সাহিত্যে 'আঞ্চলিকতার' একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক-পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে—তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না, কখনো কখনো কোনো বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এইগুলির ভিত্তিতেও কোনো লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না। ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই কোনো শিল্পীর ওপরে আরোপ করা সম্ভব—যখন বিশেষ ভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে--তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তিক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা

দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। Sanctuaryর স্রষ্টা উইলিয়ম ফক্‌নার এই অর্থেই আঞ্চলিক; কিউবার জালিক-জীবন ও সামুদ্রিক পরিবেশের সঙ্গে হেমিংওয়ের একাত্মতা তাঁর Harry Morgan এবং The Old man and the Seaতে প্রকটিত; এরস্কিন কল্‌ডওয়েলের God's Little Acre, Tragic Ground বা Tobacco Road মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অনগ্রসর দুর্গত ও অভিশপ্ত অঞ্চলের কায়িক ও আত্মিক ইতিহাস; স্টেইনবেকের The Long Valley তাঁর প্রধান সাহিত্যভূমি। জেমস জয়েসের Ulysses একান্তভাবেই Dubliner—আর টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস্' তো স্বনামধন্য। এ জাতীয় তালিকা বাড়িয়ে আর লাভ নেই এ প্রায় অফুরন্ত।

আসল কথা হল, এঁদের সাহিত্যসৃষ্টি এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই সঞ্জাত এবং এই পটভূমিকে ভুলে গেলে এঁদের শিল্পিসত্তা বা শিল্পরূপ কোনোটিকেই যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্রষ্টার ব্যক্তি চরিত্র যেহেতু এই বিশিষ্ট পরিবেশে গড়ে ওঠে, সেই কারণেই তাঁর বিশ্বাস-সংস্কার, শুভাশুভবোধ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা প্রতিবেশী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর প্রতীতিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারাশঙ্করকে জানবার জন্যেও তাই তাঁর ভৌগোলিক এবং মানবিক জগৎটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দরকার।

হার্ডির পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের মতো, সেই রহস্যময় মহিমময়

Egdon Heath-এর মতো এই জগৎটি রাঢ় অঞ্চল—প্রধানত বীরভূম জেলা। এর এক প্রান্তে শাল-পলাশের বন, আর এক প্রান্ত গিয়ে সীমা টেনেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাটে। মাঝখানে কোথাও কোথাও ফসলে ভরা ক্ষেত—কোথাও বা মহানাগের বিষনিঃশ্বাসে জর্জরিত কঙ্কর-বিকীর্ণ বিশাল ব্রহ্মডাঙা— যার নাম হয়তো 'ছাতিফাটার মাঠ'। এরই মধ্যে কোথাও দুটো-একটা 'আখড়াইয়ের দীঘি'ও চোখে পড়বে—নবাবী আমলের শড়কের পাশে যেখানে মানুষ শিকারের আশায় ঠ্যাঙাড়েরা ক্ষুধিত বাঘের মতো অপেক্ষা করত। আবার এর ভেতরে দেবী অট্টহাসের মন্দিরও ইতিহাস-কিংবদন্তীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছে— যেখানে এসে পৌঁছুলে এ-যুগের বৈজ্ঞানিক মানুষের জাগ্রত বুদ্ধিও কিছুক্ষণের জন্যে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই মাটি হার্ডির মৃত্তিকার মতোই জীবন্ত—"Like men, slighted and enduring, and withal singularly colossal and mysterious in its swarthy monotony....It had a lonely face, suggesting tragical possibilities." তারাশঙ্করের এই ভূগোলক্ষেত্রও অনুরূপ tragical possibilities সংকেতিত করে।

এই পটভূমিতে যারা বাস করে—তারা হল কাহার, বাউরী, বাগদী, সাঁওতাল ও বীরবংশী প্রভৃতি আদিম মানুষের দল। কোথাও কোথাও "বেদে"র টোল দেখা যায়—তারা জংলি জড়িবুটী দিয়ে কালনাগিনী বশ করে আর পৌরুষ দিয়ে জয়

করে কালনাগিনীর চাইতেও বিষধরী বেদের মেয়েকে। পুরোনো জমিদারবংশ 'জলসাঘরের' ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর অতীতের উন্মত্ত বিলাস-সম্ভোগের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে লালন করে চলে। চোর, খুনী, গুণ্ডা বা ভবঘুরেরা চার দিকে ঘুরে বেড়ায়--বিচিত্র ধরনের পাগলদের ইতস্তত দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা কুসংস্কার ও অশিক্ষার প্রভাবে সমাজের নিম্নবর্ণেব মানুষগুলিব প্রায় সমপর্যায়ে নেমে আসে। প্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই কুৎসিত-কদাকার, বিকলাঙ্গ ও প্রায়ই বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু দেখতে কদাকার হলেও তাদেব ভেতরে অনেক সময়েই এক ধরনের আদিম সারল্য প্রকটিত; স্নেহের ক্ষুধা, বাৎসল্যের ক্ষুধা বা লালসার ক্ষুধা তাদের প্রায়ই পবিচালিত করে। বিষধর সাপ, বিশাল মহিষ বা উন্মত্তগতি অশ্বের সঙ্গে তাদের এক ধরনের মানসিক আত্মীয়তাবোধ আছে। এক কথায় তারা Elemental –তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সংগ্রাম যেন পাঠককে জীবজগতের আদি struggle for existenceকে স্মরণ কবিয়ে দেয়। রূঢ়, রুক্ষ, নিষ্ঠুর এই জান্তব-রণভূমিতে এক-আধটি মরূদ্যানের মতো পাওয়া যায় বৈষ্ণবের আখড়া-- মাধবীলতার কুঞ্জবিতান থেকে খঞ্জনী-একতারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিক্ষিত নারীকণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলীর ঝঙ্কার ওঠে। হার্ডির চরিত্রগুলির মতো এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধেও বলা যায়: "the inevitable outcome of a special environment"!

অন্নসমস্যা, যৌনসমস্যা, মানসবিকৃতি—ইত্যাদি ছাড়াও তাদের সামনে আরো একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই আদিম ভূমিতে নতুন যুগ এসে আবির্ভূত হয়েছে—এনেছে শিক্ষা-দীক্ষা কলকারখানা এবং নতুন কালের অন্যান্য আনুষঙ্গিক। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নবীণ-প্রবীণে একটা বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। অতীত ও উত্তরাধিকারের প্রতি বিশ্বাসবান তারাশঙ্করের রচনায় নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব কখনো প্রত্যক্ষ, কখনও বা পরোক্ষরূপে বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুনের জয়কে স্বীকার করেও পরাভূত অতীতের জন্যে তারাশঙ্কর অকৃত্রিম সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন!

এই ভূগোলভূমি এবং মানবভূমির বিচারে তারাশঙ্করের গল্প-সাহিত্যের মোটামুটি একটা বৃত্তরেখা পাওয়া যায়। রাঢ়ের কঙ্করাকীর্ণ জলহীন প্রান্তবে মধ্যাহ্ন সূর্যের যে অসহ্য দাহ--যে বুকফাটা পিপাসা, তাঁর গল্পের মধ্যে তারই জ্বালাভরা এক শুষ্ক লেলিহ-রসনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। লোভ, লালসা, কামনা ও স্নেহ,--সব কিছুই যেন এই খররৌদ্রের রৌদ্ররসে অভিষিক্ত। বিশাল মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা মৃদু কণ্ঠে দূরের মানুষকে ডাকতে পারে না—তাই তারা প্রায়শ উচ্চকণ্ঠ; নিজের আবেগকে তারা সংযত করতে পারে না সে মনঃপ্রকর্ষ তারা পায় নি, তাই প্রায়ই তারা extreme character রূপে দেখা দেয়। অতীতের বিশ্বাস ও সংস্কারে তারা আচ্ছন্ন; সেই জন্যে জীবনের ব্যর্থতা, শোক, বেদনার সান্ত্বনা লাভ করে

মহাশ্মশানের প্রসারিত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে; যন্ত্রযুগের সঙ্গে তাদের পরিচয় প্রীতির নয় — তাই কৃষিজীবীর property instinct-এ মাটি সম্পর্কে তাদের রোম্যান্টিক মমত্ব আছে; তাদের শারীরিক কুশ্রীতা এবং কখনো কখনো বিশিষ্ট অঙ্গবিকৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে বহিরঙ্গই মানুষের চরম রূপ নয় তাদের প্রাণলোকের নেপথ্যে স্নেহ-প্রেমের যে ফল্গুধারা বইছে, তার পরিচয়েই তাদের যথার্থ পরিচয়।

গল্পগুলির গঠনরূপ সম্পর্কেও একটি বক্তব্য সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নাট্যকাররূপে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে গিয়ে যে ক্ষোভ তারাশঙ্কর অনুভব করেছিলেন যে হতাশা তাঁকে মর্মবেদনা দিয়েছিল, হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনি তাঁর সেই বঞ্চিত নাট্যকার সত্তাকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাই তারা নাট্যলক্ষণাক্রান্ত— extreme character সৃষ্টির জন্যে কখনো কখনো অতি নাটকীয় বলেও মনে হতে পারে। যেমন 'মতিলালের' মতিলাল, 'বোবা কান্নার' শশী ডোম, 'ইস্কাপনের' ইস্কাপন।

তারাশঙ্করের গল্পের আঙ্গিক বিচার করলে বলা যায়, তাঁর অধিকাংশ গল্পই "টেল" পর্যায়ের। আধুনিক ছোটগল্পে উপকরণের অংশ সামান্যই জীবনের কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ভাবকে তির্যক-রীতিতে ইঙ্গিতধর্মী পরিণতিতে শিল্পিত করাই তার কাজ। সেই জন্য একালের ছোটগল্পের

"আরম্ভও নেই শেষও নেই"। চকিত-বিদ্যুদালোকে দিগ্‌দিগন্তের উদ্ভাসনই তার লক্ষ্য। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে ইঙ্গিতধর্মিতার চাইতেও কাহিনী-পরিণামই প্রধান। ধীর-স্থির সূচনা, চরিত্র-গুলির পূর্ণবিকাশ, একাধিক ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি এবং সর্বশেষে ঘটনার একটি সুনিশ্চিত পরিণতি বিন্যাস করে তিনি পাঠকের তৃপ্তিবিধান করেন তাঁর মনের সম্মুখে কোনো সংশয় রেখে যান না। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আদিম জীবনাশ্রয়ী কাহিনীতে ইঙ্গিতধর্মী পরিণতি থাকতে পারে না। অমার্জিত প্রায়-পাশবজীবন ফক্‌নাবেরও অবলম্বন, কিন্তু সেখানে লেখক যুগোপযোগী ইঙ্গিতগর্ভতা রক্ষা করতে পেরেছেন। বস্তুত, তারাশঙ্করের হাতে অজন্তার ভাস্করেব তুলি নেই তিনি তিববতী তান্ত্রিকদের রীতিতে 'মারেব' ভয়ালতম রূপ পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান। কোনো ছায়াচ্ছন্নতা নয়— একেবারে অতি উজ্জ্বল, অতি স্পষ্ট উদঘাটন। তাই তাঁর অনেক গল্পকেই আয়তনে কিছু বাড়িয়ে দিয়ে উপন্যাসে পরিণত করা যায় - তারাশঙ্করও তা করেছেন। গল্পগুলির নাট্যধর্মিতাও লেখক নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন—'নুটু মোক্তারের সওয়াল' অবলীলাক্রমে "দুই পুরুষে" উত্তীর্ণ হয়েছে।

॥ ৩ ॥

তারাশঙ্কর মুখ্যত জনসাধারণের শিল্পী। এই জনসাধারণ আবার নীচের তলার মানুষ। অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণ যারা আছে,

তারাও মানসিকতাব দিক থেকে এদেরই আত্মজন। আঞ্চলিকতা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের সাহিত্যে যে জনগণের সন্ধান মেলে—দেশের যে বৃহত্তর সমষ্টির সংবাদ তাঁর গল্প-সাহিত্যে পাওয়া যায়, এর পূর্বে আমরা আর কারো কাছ থেকে তা পাই নি সে-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। শৈলজানন্দ এর সূচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যৌন-সমস্যামুখ্যতা শৈলজানন্দকে অনেকখানি সংকীর্ণ আর সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। তারাশঙ্কর ব্যাপকতর এবং গভীরতর।

তারাশঙ্করের গল্পে যে-অংশে আদিমতার লীলা সেই অংশটির সঙ্গে কল্লোলীয়দের ভাবগত সাধর্ম্য আছে। প্রথম যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতার ক্ষোভ এবং প্রায় নৈরাজ্যমূলক মনোভাব, যৌন-সংস্কার সম্বন্ধে মোহমুক্ত ভঙ্গি, রাসেল-লরেন্স-হাক্স্লির শিষ্যত্ব—কল্লোলীয় মূল লেখকদের যে শূন্যতার জগতে পৌঁছে দিয়েছিল—দেশের মানুষের রিক্ত, অমার্জিত জান্তব রূপ তারাশঙ্করকেও তেমনি একটা নৈরাজ্যে কখনো কখনো উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। সেই নৈরাজ্যের নিদর্শন 'তিন শূন্য'— বাংলা সাহিত্যে এই বীভৎস গল্পটির তুলনা নেই। 'বেদেনী' গল্পেব রাধা যখন শম্ভুর তাঁবুতে আগুন দিযে কিষ্ট বেদের সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে, তখন ধর্মহীন নীতি-হীন জৈবশক্তির মত্ততা আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি মনে পড়িয়ে দেয়। 'তারিণী মাঝি' ময়ূরাক্ষীর দুরন্ত বানের মধ্যে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত এই

অন্ধ জৈবসত্তার তাগিদেই সুখীর গলা টিপে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। মানুষের পশুত্বের দিক থেকে 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে'ও অদ্বিতীয়।

আদিমতার রূপ সব চাইতে চমৎকার ভাবে ফুটেছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পে। আমার মনে হয়, শিল্প-কুশলতার দিক থেকে এইটিই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প। বালজাকের বিশ্ববিখ্যাত গল্প Passion in the Desert এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে আসে। মরুভূমির ভেতরে দলভ্রষ্ট পথভ্রষ্ট এক নিরুপায় সৈনিক কেমন করে এক বাঘিনীর সঙ্গে অদ্ভুত বাসনা-বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল, এই গল্পে তার চমকপ্রদ বিবরণ আছে। তারাশঙ্কর 'নারী ও নাগিনী' তার সম-পর্যায়ের। অথবা তার চাইতেও দৃঢ়নিবদ্ধ এবং রসগভীর।

কাহিনীর নায়িকা উদয়নাগ সাপিনী। প্রতিনায়িকা জোবেদা এবং নায়ক নেশাখোর বিকলাঙ্গ খোঁড়া অদাই শেখ। অদাইয়ের স্ত্রী জোবেদার সপত্নী সাপিনীর প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষ্যা এবং পরিশেষে সাপিনীর দংশনে তার প্রাণান্ত— এই হল গল্পের বিষয়বস্তু। এ যেন সাধারণ সংসারেই যে-কোনো একটি ত্রিকোণাকার ভয়াবহ কাহিনী। কিন্তু রচনার কৌশলে, মিত-ভাষিতায়, ইঙ্গিতের তীক্ষ্ণ তির্যকতায় এবং গল্পের গতি-নিয়ন্ত্রণের নৈপুণ্যে এটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পসাফল্যে মণ্ডিত হয়েছে। বালজাকের নায়ক মুক্তি পাওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত বাঘিনীর বুকে ছুরি বসিয়ে হত্যা করেছিল, কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে

জোবেদাকে ছোবল মারা সত্ত্বেও "বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই এই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।" তারাশঙ্করের এই সমাপ্তি, সার্থক গল্পরীতির একটি চমৎকার উদাহরণরূপে নির্দেশিত হওয়ার দাবি রাখে।

আদিম বৃত্তির লীলা আর একদিক থেকে চরমরূপে প্রকাশ পেয়েছে তারাশঙ্করের বিখ্যাত 'অগ্রদানী' গল্পে। উদর-সর্বস্ব, নির্লজ্জ হীনচিত্ত, পূর্ণ চক্রবর্তীর যে পরিণাম এতে দেখানো হয়েছে তা যেমন কুৎসিত, তেমনি কল্পনাতীতরূপে ভয়ঙ্কর। লোভের দুর্জয় আকর্ষণে বিমূঢ়চিত্ত চক্রবর্তী রসাতলের শেষ ধাপে নেমেছে—সিংহবাহিনীর অমৃতবৎ ভোগ পরিণামে নিজ পুত্রের বিযাক্ত পিণ্ড হয়ে চক্রবর্তীর গলায় প্রবেশ করেছে। এই গল্পে লেখক ক্ষমাহীন এক নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় চক্রবর্তীর ওপরে নিষ্ঠুরতম দণ্ড বিধান করেছেন। গল্পের শেষে :

"শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।"

অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান কোনো লেখক কিছুতেই নির্মমতার এই স্তরে নামতে পারতেন না। কিন্তু তারাশঙ্করের লেখনী অকম্পিত। তান্ত্রিকসুলভ নিরাসক্তি নিয়ে তিনি লোভের খড়্গে চক্রবর্তীকে বলি দিয়েছেন। গল্পটি তাঁর নির্ভীক শিল্পি-সত্তার আর একটি নির্ভুল নিদর্শন।

বিকৃত, কদাকার, প্রায়-পাশবিক চরিত্রের প্রতি তারাশঙ্করের যে একটা বিচিত্র আসক্তি আছে সেটা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এদেরই কারো কারো অঙ্গবিকৃতি আছে, কেউ কেউ বা অমিত শক্তিধর। মোটের ওপর সব মিলিয়ে তাদের জৈবিক বলে মনে হয়। বীরভূমের রোদে-পোড়া কাঁকুরে মাটিতে চলতে-ফিরতে 'ফসিলের' টুকরো পাওয়া যায় -আদি-পৃথিবীর সঙ্গে আজও যেন তার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি। এই চরিত্রগুলিও যেন আদিম মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

কিন্তু আদিমতার উদ্দাম উল্লাস পশুর পক্ষে একান্ত সত্য হলেও মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে পশু নয়। মানুষ স্বতন্ত্র হয়েছে বুদ্ধির গৌরবে আর হৃদয়বৃত্তির প্রসারতায়। এই হৃদয়বৃত্তিই মানুষের সব চাইতে বড় বালাই। Love comes and the beast dies -তারাশঙ্করের অনেক কটি গল্পেই এই সত্যের অনুরণন শোনা-যায়।

প্রকৃতিজাত (Instinctive) কিছু প্রেরণা পশুর ক্ষেত্রেও নেই তা নয়; তারও কিছু কিছু বাৎসল্য আছে—সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রয়োজনে ত্যাগস্বীকার আছে। কিন্তু বস্তুত তার মধ্যেও আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যটিই সক্রিয়। কিন্তু আত্মপরতার সীমা যেখানে অতিক্রান্ত, সেইখানেই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাপীঠ। পশুর মর্মস্থলে প্রেমের মৃত্যুবাণ বিঁধিয়ে তারাশঙ্কর কয়েকটি চমকপ্রদ গল্প রচনা করেছেন।

এরই নিদর্শন 'মতিলাল।' গাজনের সঙে মতিলাল ভালুক

সাজে। ভালুক সাজার মতোই তার চেহারা। তার স্বাভাবিক মূর্তিটিও কেবল ছেলেদেরই নয়—তাদের অভিভাবকদের মনে পর্যন্ত আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে। তারাশঙ্কর মতিলালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

"হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মতো কালো রঙ, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুটো আমড়াব আঁটির মত গোল এবং মোটা, দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মুখগহ্বরের পবিধি আকর্ণ-বিস্তৃত। সেই মুখগহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল।"

এই রূপবিবৃতি মানুষের নয়—রাক্ষসের। এর গৃহলক্ষ্মী 'ভোবন' বা ভুবনমোহিনীর রূপও স্বামীর সহধর্মিণীরই উপযুক্ত। "অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে, অমনই পবিধিতে। মাথার সম্মুখেই সিঁথি জুড়িয়া একটা টাক, প্রকাণ্ড বড় মুখের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটা চোখ, লম্বা নাক, তাহার উপর উপরের ঠোঁটের এক পাশের খানিকটা মাংস নাই, সেদিক দিয়া দুইটি দাঁত নীচেব ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।" চেহারার দিক থেকে পতি-পত্নীর সম্পূর্ণ রাজযোটক মিল হয়েছে সে-কথা বলা যেতে পারে।

অথচ এই কদাকার beast-এর অন্তরে যে ভয়াবহ যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা একান্ত মানুষেরই সেইখানেই beast-এর মর্মস্থলে মরণবাণ বিদ্ধ হয়েছে। নিঃসন্তান স্বামি-স্ত্রী তাদের স্নেহবুভুক্ষু

অন্তরকে তৃষ্ণাভূমির মতো প্রসারিত করে দিয়ে বসে আছে—পরের ছেলেকে কিছুক্ষণের জন্যে কাছে পেলেও তাদের হৃদয়-মরুক্ষেত্রে কয়েক বিন্দু জলসেচন ঘটে। অথচ কুৎসিত ভয়ঙ্কর চেহারাই তাদের প্রতিবন্ধক। বাৎসল্যের দহন-জ্বালায় শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ মতিলালকে যে কঠিন দুঃখ পেতে হয়, তা আমাদের সৎ-পবিত্র অশ্রুকে আকর্ষণ করে।

এই জাতীয় গল্পের চরম অভিব্যক্তি 'ডাইনি'। ছাতিফাটার মাঠের বর্ণনায়, চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে এবং প্রকাশের তীক্ষ্ণতায় তারাশঙ্করের অন্যতম প্রধান গল্প এইটি। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল - করবারই কথা।

'ডাইনি' গল্পের পটভূমি রচনাতেই লেখক এক অগ্নিময় তৃষ্ণাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রুদ্র-প্রকৃতির বর্ণনায় বাংলা সাহিত্যে 'ছাতিফাটার মাঠে'র তুলনা পাওয়া শক্ত। অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করবার প্রলোভন সংবরণ করা গেল না :

"ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মতো ধূলার একটা ধূসর আস্তরণ মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতিফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম-ধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ।" *

* এর সঙ্গে The Return of the Native-এ Egdon Heath-এর আশ্চর্য বর্ণনা স্মরণীয় : "Every night its titanic form seemed to

এই পরিবেশে তারাশঙ্কর একটি তথাকথিত 'ডাকিনী'কে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে অনাথা মেয়ে অপরাধের মধ্যে তার চোখ দুটো "নরুন দিয়ে চেরা, ছুরির মতো" তাতে "বিড়ালীর মতো দৃষ্টি"। ঘটনাচক্রে ও যোগাযোগে ওই চোখের জন্যে তার ডাইনি অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে পড়ে—তারই রক্ত শুষে যায় সে-দৃষ্টির বিকৃত ক্ষুধার কাছে তার নিজের স্বামি-সন্তান কেউ বাদ পড়ে নি। অবশেষে শেষ পর্যন্ত সে নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, সে ডাইনি—আর অসহ্য যন্ত্রণায় ছাতিফাটার মাঠের একান্তে সে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছে। এই হতভাগিনী নারীর স্নেহ-প্রেম-বঞ্চিত অভিশপ্ত জীবনের বীভৎস পরিণাম 'ডাইনি' গল্পটির বক্তব্য।

অসাধারণ এই গল্প। কুসংস্কারের ভিত্তিতে একটি গ্রামের মেয়ের দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত এতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু অদ্ভুত বলিষ্ঠতায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বিখ্যাত ভৌতিক গল্পলেখক W. R. James "ডাইনিতন্ত্র" নিয়ে

await something, but it had waited thus unmoved during so many centuries, through the crises of so many things, that it could only be imagined to await one last crisis—the overthrow. Twilight combined with the scenary of Egdon Heath to evolve a thing majestic without severity, impressive without showiness, emphatic in its admonitions grown into its simplicity."—The Three Women, Chapter I

'The Ash Tree' নামে একটি রোমাঞ্চকর গল্প লিখেছিলেন। তারাশঙ্করের 'ডাইনি' মানবিক আর্তির কাহিনী হয়েও শিল্প-কুশলতায় জেম্‌সের Witchcraft-এর বিভীষিকাকে ছাপিয়ে গেছে, মনে হয়। 'নারী ও নাগিনী'র মতোই এই গল্পটিও বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে থাকবে।

'তমসা' গল্পও এই পর্যায়ে পড়ে। এই গল্পের নায়ক পঙ্কী—অনাথ, বাউণ্ডুলে একটি অন্ধ ছেলে। রেলস্টেশনে ভিক্ষা করাই তার উপজীবিকা। তারও "কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাতপাগুলো অপুষ্ট।" এই অন্ধ কুরূপ পঙ্কী গানের সুরে এবং কথার মাধুর্যে থিয়েটারের দলের এক মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল। তার জৈবিক-জীবনে ন'তুন করে এসে দোলা লাগল—তার চোখের অন্ধ-তমসার সামনে না-দেখা মেয়েটি একটি অপূর্ব সুরময় মূর্তিতে জীবন্ত হয়ে রইল—তাই হল তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।

পশু-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে পশুর আত্মীয়তাও স্বাভাবিক ধর্ম। তাই এই ধরনের জৈবানুভূতি-সর্বস্ব মানুষের পাশে পাশে পশুও স্নেহ-দুর্বলতা-আত্মচেতনার মৃত্যুবাণে বিদ্ধ হয়েছে। তার নিদর্শন "কালা পাহাড়" নামে বিশাল মহিষটি--"গবিন সিংহের ঘোড়া" 'প্রবীণ'। 'কালাপাহাড়ের' অপমৃত্যু আর 'প্রবীণের' আত্মহত্যা মানবিক-বেদনার অভিসেচন লাভ করেছে।

শিল্পী হিসেবে তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে রিয়্যালিস্ট্। কিন্তু তা হলেও প্রাচীন জমিদারতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে এক ধরনের মোহ আছে এবং সেই মোহ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ গল্প 'জলসাঘরে।' আঙ্গিকের দিক থেকে 'জলসাঘর' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই গল্পের একটি পূর্বভাষ আছে 'রায়-বাড়িতে', কিন্তু উৎকর্ষের বিচারে এবং বক্তব্যের পরিপূর্ণতায় 'জলসাঘরের' সঙ্গে 'রায়বাড়ি'র কোনো তুলনাই চলে না।

নির্বাপিতপ্রায় জমিদার-বংশের শেষ-প্রদীপ বিশ্বম্ভর রায় শেষবারের মতো তাঁর 'জলসাঘরে' সহস্রচ্ছটা ছড়িয়ে কি ভাবে মহানির্বাপণের মধ্যে তলিয়ে গেলেন—নাটকীয় বিন্যাসের মধ্যে এই গল্পে তা বলা হয়েছে। রোম্যান্টিক্ আবেগ এবং নাট্যরসের পরিবেশনে গল্পটি উপভোগ্য। কিন্তু 'জলসাঘরের' বক্তব্য এখানেই শেষ নয়। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে পুরাতনের পরাজয়ের ওপর তারাশঙ্করের যে দীর্ঘশ্বাস বর্ষিত হয়েছে—এই গল্পের সেইটিই মূল সূত্র। "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" উপন্যাসে যা স্পষ্ট ও বিস্তৃত ভাবে বলা আছে, এই গল্পে তার সংকেত পাওয়া যায়। নতুন ধনী মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে অতীতের ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বম্ভর রায়ের সংঘর্ষ 'জলসাঘর' গল্পে লেখকের বিশিষ্ট মনো-ভঙ্গিরূপে উপস্থিত হয়েছে।

গ্রাম্য সমাজের গ্লানি-বিকৃতির উন্মোচনে রিয়্যালিস্ট তারাশঙ্কর কখনো কখনো ন্যাচারালিস্টের পর্যায়ে নেমেছেন—যা সাহিত্য-সংস্কারের বিরোধী, যাদের উপস্থাপনাকে এতকাল শিল্পীরা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন—প্রয়োজনবোধে তারাশঙ্কর তাদের অনেক কিছুকেই নিঃসংকোচে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু রিয়্যালিস্ট হলেও তারাশঙ্কর ঐতিহ্য-বিশ্বাসী—যা বংশগত সংস্কারগত উত্তরাধিকারে আমাদের মধ্যে এতকাল ধরে চলে আসছে—তাকে কখনো কখনো নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত দিলেও তার কোনো ঐকান্তিক পরিবর্তন তিনি কামনা করতে পারেন নি। রাজনৈতিক মতবাদকে তারাশঙ্কর মানবতাবাদের মধ্যে প্রসারিত করেছেন, কিন্তু গ্রামীণ বিশ্বাস-সংস্কারকেও অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়েছে।

তাই অতীত আর বর্তমান—ক্রমাবক্ষয়ী পুরাতন আর অপ্রতিরোধ্য নবীন—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তারও দ্বন্দ্ব। 'গবিন সিংহের ঘোড়া'র প্রবীণ কিংবা 'জলসাঘরের' তুফান—এই দুটি ঘোড়াই যেন নতুন-পুরোনোর শেষ প্রতি-যোগিতায় নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"র করালী ও বনোয়ারীর সংঘর্ষ এরই বিস্তৃত রূপায়ণ।

তারাশঙ্করের যুক্তিসচেতন মন এ সত্য উপলব্ধি করে, যে নতুনের আবির্ভাবকে প্রতিহত করবার শক্তি কারো নেই—'বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন' যুগসত্যরূপে

অনিবার্যতায় আসন্ন হবে। তারাশঙ্কর হয়তো সজ্ঞানে এই যুগ-প্রবাহের বিরোধিতা করতে চান নি, কিন্তু তাঁর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া খানিকটা অবচেতন ভাবে নতুনের নির্মমতাকেই যেন প্রধানত অভিব্যক্ত করতে চেয়েছে।

তারাশঙ্করের এই বিশিষ্ট মনস্তত্ত্বটি তাঁর বহু গল্পেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপস্থিত হয়েছে। এই মনোভঙ্গিরই আলোক-সম্পাত 'খাজাঞ্চি বাবু' গল্পে—যেখানে বার্ধক্যের অপরাধে খাজাঞ্চি বাবু চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। এই মনোভাব থেকেই 'ময়দানব' গল্পের উৎপত্তি—নতুন বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাবেই পুরানো কারখানার সর্বেসর্বা ফণী মিস্ত্রীকে সইতে হয় চূড়ান্ত অপমান, আর সেই অপমানের বেদনা ভুলতে ফণীকে কারখানার গ্রাইণ্ডিং মেশিনের চাকার দাঁতে আত্মবলি দিতে হয়: "কারখানা তাকে ছেড়ে দেয়নি। সে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে—তার দাঁতের দু-পাশে বেয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো—পাশে মেঝের উপর পড়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের টুকরো"—

'পিতাপুত্র' গল্পের ভিত্তিও এই। ইংরেজিবিদ্যাবিশারদ পুত্র শশিশেখরের সঙ্গে টোল ও সংস্কৃত-পন্থী ন্যায়তীর্থের বিরোধ এবং পরিশেষে শশিশেখরের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে গল্পের করুণ মর্মচ্ছেদী পরিণাম। অতীতের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারাশঙ্করের মনে যে দ্বন্দ্ব সব সময়েই সজাগ হয়ে থেকে তাঁর শিল্পচেতনাকে আঘাত করছে, এই গল্পে তার আভাস পাওয়া যায়। 'নুটু

মোক্তারের সওয়ালে'ও এরই ইঙ্গিত আছে। পুরাতনের পরাজয় অপরিহার্য জেনেও তার সম্পর্কে তারাশঙ্কর নিজের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস কখনো গোপন করতে পারেন নি।

কিন্তু এই দ্বন্দ্বও শেষ পর্যন্ত এসে যেন এক সর্বাত্মক শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। সেখানে নবীনও নেই—প্রবীণও নয়। সর্বগ্রাসী হাহাকারের মধ্যে নতুন-পুরাতন একই চিতাশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমরা মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলোর কথাই স্মরণ করছি।

এই পর্যায়ের দুটি শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় গল্প হল 'বোবা কান্না' ও 'পৌষলক্ষ্মী'। 'বোবা কান্না'র ঘটনাক্ষেত্র মন্বন্তর-সঞ্জাত মহামারীগ্রস্ত গ্রাম—মৃত্যুর এই নারকীয় পরিবেশে চণ্ডী মায়ের পূজারী দৈব-মহিমায় বিশ্বাসী ত্রিপুরা ভট্টাচার্য ও তরুণ ডাক্তার মিহির মুখুজ্জের মধ্যে অতীত ও বর্তমান—সংস্কার ও বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। (তারাশঙ্করের "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসের ভাবগত সূচনা এই গল্পে আছে।) মহামারীতে মৃত আন্নু ঠাকুরের বিধবা বোবা স্ত্রীকে মাঝখানে রেখে এই সংঘর্ষ তীব্র ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। গ্রামের বিখ্যাত চোর শশী ডোমকে এর মধ্যে জুড়ে দিয়ে গল্পটির গতি বিচিত্রমুখী করে তোলা হয়েছে। রচনার দিক থেকে গল্পটি ঘনসন্নদ্ধ নয়—এই মহামারীর প্রভাবেই যেন চরিত্রগুলি অসংযত ও extreme—একটা অন্ধ আবেগ ও উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে যেন তারা প্রত্যেকেই অগ্রসর হয়েছে; শশীকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ায় গল্পটির ভাবসংহতিও রক্ষিত

হয় নি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে ওই বোবা বধূটির মর্মভেদী শোক—তার 'বোবা কান্নাই' কেবল গল্পের বক্তব্য নয় এ সমগ্র জাতির অসহায় বোবা কান্নার প্রতীক। গল্পের সমাপ্তিতে শশী ডোম গলায় দড়ি দিয়ে এই সত্যটিই যেন জানিয়ে যায়: নিষ্ঠুর অন্ধ মৃত্যুর কাছে পুরাতনের বিশ্বাস আর নতুনের আত্মপ্রত্যয় দুই-ই সমান নিরর্থক। মন্বন্তর ও মৃত্যুর সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো চূড়ান্ত শূন্যতা আর হতাশা নিয়ে এই গল্পে ফেটে পড়েছে।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটি তারাশঙ্করের আর একটি মুখ্য রচনা। আয়তনে এটিও সুদীর্ঘ—তা হলেও এতে অন্তত ছোটগল্পসুলভ একটি ভাবসাম্য অব্যাহত আছে। এই গল্পে 'বোবা কান্না'র সর্বাত্মক নৈরাশ্যবাদ নেই—কিন্তু "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" অতীতের মহিমান্বিত মৃত্যুর বিবরণ এতে পাওয়া যায়। এ যেন 'পিগ্‌মিদের' হাতে ভবিষ্যতের ভার তুলে দিয়ে শেষ 'টাইটানে'র বিদায়-কাহিনী। এই গল্পের মুকুন্দ পাল যেন সত্যিই গ্রীক-পুরাণের সেই আদি পিতৃসত্তা তার মৃত্যুর বর্ণনায় তারাশঙ্কর মহাকাব্যের মহিমা বিন্যাস করেছেন: "গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকয়েক পা দুটো ছুঁড়লে—নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতে ধুলোর উপর, এক মুখ ধুলো কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা

প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে।"

এ শুধু পালের মৃত্যুই নয়—অতীতেরও মৃত্যু। যে প্রচণ্ড আদিম শক্তি বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্বিপাক পার হয়েও এতদিন কোনোমতে নিজের অস্তিত্বকে আঁকড়ে রেখেছিল—অবশেষে এইবার তাকে বিদায় নিতে হল। কিন্তু ভবিষ্যতের ভার কে গ্রহণ করবে এখন? চিকেষ্ট? চেকা? ঐতিহ্যহীন দম্ভস্ফীত আধুনিকের ঔদ্ধত্য? বিশ্বম্ভর রায়ের গৌরব কেড়ে নেবে হঠাৎ বড়-হয়ে-ওঠা ভুঁইফোঁড় মহিম গাঙ্গুলী?

তারাশঙ্কর তা কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না।

অতীত যাবেই—তাকে রাখা যাবে না। সূর্য যতই কাম্য হোক—এক সময় তাকেও অস্ত-আকাশে শেষ রক্তরাগ এঁকে বিদায় নিতে হবে। তারপরে সূর্যহীন রাত্রির প্রতিনিধিত্ব করবে কে? তারাশঙ্কর মনে করেন, আধুনিক কালের খদ্যোৎদীপ্তি সে দায়িত্ব নিতে পারবে না—দু-একটি সৎ-মানুষের প্রদীপও সে তমসার কাছে একান্ত নিরর্থক হয়ে যাবে।

তবে কী থাকবে? 'সন্ধ্যামণি'র শ্মশানে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্করের মন তার উত্তর খুঁজেছিল একদিন। আজ উত্তর পেয়েছে। কী থাকবে শেষ পর্যন্ত? আকাশভরা তারা। যে তারায় সপ্তর্ষিলোকের বার্তা—যেখানে ধ্রুবতারার চিরন্তন স্থির শান্ত জ্যোতিঃ। মাটিতে আর আলো খোঁজবার প্রয়োজন নেই—এখন আকাশের শাশ্বত নক্ষত্রে চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান।

মন্বন্তরের করোটি-পাত্রে যে-আকাশের স্বাতী নক্ষত্র অমৃত-বর্ষণ করে—এবার সেই অসীম অমৃতলোকের জিজ্ঞাসা।

তারাশঙ্কর যেন নচিকেতার মতোই বললেন, "যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টঃ নান্যঃ তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।" সেই গূঢ়মনুপ্রবেশের সাধনায় তদ্‌গত হলেন তিনি—অধ্যাত্মপথের দিকে অগ্রসর হলেন।

॥ ৫ ॥

তারাশঙ্করের মধ্যে এই পরিণতির বীজ বরাবরই ছিল। 'শ্মশানঘাট' আর 'বৈষ্ণবের আখড়ায়' এই বীজ গোপনে লালিত হচ্ছিল। আদিমতা ও প্রবৃত্তিবেগের পথ দিয়ে কোনো লেখকই চিরদিন চারণা করতে পারেন না, তাঁর যে হিউম্যানিস্ট মনোভঙ্গিই থাক, তাকেও একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে রূপ দিতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই সাম্যবাদের নিশ্চিত একটা লক্ষ্য বেছে নিতে হয়েছে। তারাশঙ্কর এক সময়ে সাম্যবাদের প্রতি সামান্য কিছু ঝুঁকেও পড়েছিলেন, কিন্তু নিজের মধ্যে সংগূঢ় অধ্যাত্মচেতনা এবং গান্ধীবাদের প্রতি বিশ্বাস তাঁকে সেদিক থেকে সরিয়ে এনেছে।

সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত ক্ষোভ, নতুন পুরাতনের সব দ্বন্দ্ব এসে পরিশেষে এক পরম শান্তিময় সমাধান লাভ করেছে। তাই আদিম জীবনের অন্ধকারে তারাশঙ্কর এখন সেই সত্যের

'শিলাসন' খোঁজেন—মানুষের পাপে যা কালো হয়ে গেছে—মানুষের পুণ্যে যা আবার অপরিম্লান শুভ্রতা লাভ করবে। এই আধ্যাত্মপ্রেরণা থেকেই 'মাটি' গল্পের সৃষ্টি হয়। মাটির মমতায় মেওয়ালাল তার জীবনের চরম মূল্য দিয়েছে, এমন কি তার পরমতম অবলম্বন লছমনিয়া অবধি একান্ত ঘৃণিত সাহেবের অঙ্কশায়িনী হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেওয়ালালের আর কোনো ক্ষোভ নেই। গঙ্গামৃত্তিকা সর্বাঙ্গে লেপন করে লৌকিক ক্ষোভ, দুঃখ, অহঙ্কার, বাসনা সব কিছুর মোহপাশ থেকে সে মুক্তিলাভ করেছে—এমন এক তৃপ্তি আর অনাসক্ত আনন্দের জগতে সে উত্তীর্ণ হয়েছে—যেখানে তাকে সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করা যায়।

'কামধেনু'র নাথুও তাই ফাঁসির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এক অপূর্ব প্রশান্তিতে মগ্ন হয়ে গেছে। সুরভি-মাতার কাছে যে অপরাধ করেছে সে, তার প্রায়শ্চিত্তে তার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। 'ইমারতে'র অপূর্ব চরিত্র জনাব--যে সারা জীবন অন্যের ঘর গড়ে দিয়েছে, অথচ নিজের শেষ সময়ে যার মাথা গুঁজবার ঠাঁই জুটল না, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে সে তার অন্তিম স্বস্তিবাচন জানায় আত্মত্যাগী মহামানবদের মতো। যিনি দীন-দুনিয়ার মালিক শেষ পর্যন্ত জনাবের জন্যে তিনিও তাঁর আশ্রয়ের বাহু মেলে ধরেন :

"ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।”

তারাশঙ্করের ছোট গল্পে এই যে আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি—এই যে গ্লানিহীন, ক্ষোভহীন এক উদার শান্তি বিকীর্ণ হয়েছে—তার ধারা আজ পর্যন্ত চলেছে। তাঁর সর্বশেষ বিখ্যাত গল্প ‘সপ্তপদী’র কৃষ্ণস্বামী পর্যন্ত এই ভাবেই ভাবিত। গান্ধীবাদের আদর্শের মধ্যেও অধ্যাত্ম-পরিণাম আছে—তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিন্তাধারাও সেইজন্যে অধ্যাত্মমূলক এক উদার মানবতার সন্ধান পেয়েছে।

সেইজন্যে জীবন ও মানুষের পরিণাম সম্পর্কে তারাশঙ্করের শেষ কথা ‘সত্যপ্রিয়ের কাহিনী’। গল্পটি রূপক। হিংসা নয়, অশ্রুপাত নয়, গণবিপ্লবের উন্মত্ততাও নয়। আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও শান্তির মধ্য দিয়ে মানুষের পরম সিদ্ধি ও সফলতা অর্জিত হবে একদিন। সত্যপ্রিয় তারই অগ্রদূত। গান্ধীজীর জীবন-সত্য আর একটি রূপক কাহিনীতে তিনি প্রকাশ করেছেন, তার নাম ‘শেষ কথা’।

তারাশঙ্করের এই পরবর্তী আশাবাদ সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। এই ধরনের গল্পগুলিতে যে বিশেষ ধরনের রস-নিষ্পত্তি ঘটেছে—তার আস্বাদন সকলে সমভাবে করবেন কি না তাও বলা শক্ত। তবে, সামগ্রিক আবেদন থাক বা না-ই থাক,

এদের মধ্যে যেগুলিতে শৈল্পিক সাফল্য আছে, তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়। এই প্রেক্ষিতে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে 'ইমারত' একটি সুন্দর সার্থক গল্প।

এ ছাড়াও লোক-চরিত্রের ভিত্তিতে তারাশঙ্করের কয়েকটি ভালো গল্প আছে। কোনো বিশিষ্ট মনোভঙ্গি দিয়ে চিহ্নিত না করা গেলেও এরা স্বয়ংসিদ্ধভাবেই রসোজ্জ্বল। এদের মধ্যে স্মরণীয় 'তাসের ঘর' এবং 'দেবতার ব্যাধি'। 'তাসের ঘরে' মিথ্যাবাদিনী একটি বধূর চরিত্রের দিক তারাশঙ্কর সরস কোমলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন—এমন কৌতুক-মধুর অথচ অশ্রুচিহ্নিত রচনা তাঁর গল্পসাহিত্যে দুর্লভ। 'দেবতার ব্যাধি' মানুষের গহনলোকের এক বিচিত্র বৃত্তান্ত। মহত্ত্ব ও পরোপকার-বৃত্তির মহিমায় উজ্জ্বল ডাক্তার গড়গড়ি নিজের ভেতরেই এক শয়তানের সুকঠিন শৃঙ্খল অনুভব করে—সে তার বিকৃত দেহলালসা। দেবত্ব ও পশুত্বের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত এই চরিত্রটির অন্তর-যন্ত্রণার শিল্পসংযত রূপায়ণে তারাশঙ্কর অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম যুগের রচনা হলে হয়তো এই গল্পে শেষ পর্যন্ত পশুধর্মই জয়যুক্ত হত— কিন্তু উত্তর-জীবনের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু দার্শনিক মন 'দেবতার ব্যাধি'তে পরিণামে দেবত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে—অসীম আত্মশক্তির বলে স্টিভেনসনের মিস্টার হাইড এখানে পরাভূত হয়েছে। বিশুদ্ধ রোম্যান্সের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বিশেষ দীপ্তি পান না—তাঁর তান্ত্রিকসুলভ কাঠিন্য সেইজন্য 'রসকলি'তে একবার ঝঙ্কার তুলেই থেমে গেছে।

অবশ্য উপন্যাসে—“কবি” এবং “রাইকমলে” তিনি এর কিছুটা ক্ষতিপূরণ করেছেন। পারিবারিক গল্পের শান্ত মাধুর্যলীলাতেও তারাশঙ্কর বিশেষ উৎসাহিত নন—তাই ‘তাসের ঘরের’ মতো গল্পও তিনি দুটি একটি ছাড়া লিখতে পারেন নি।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে, তারাশঙ্করের ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত, কখনো অমার্জিত, গ্রীষ্মদগ্ধ বীরভূমের প্রকৃতির মতোই রুদ্র-রৌদ্রোজ্জ্বল। স্বভাবতই এই ভাষায় ইঙ্গিতের চাইতে বিবৃতি সার্থকতর এবং তারাশঙ্করের দীর্ঘচ্ছন্দ বিস্তৃত কাহিনী এই ভাষার মাধ্যমেই স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করেছে।

টাইপ চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্রের জন্যেও বাংলা সাহিত্যে গল্পকার তারাশঙ্করের প্রতিষ্ঠা সুদীর্ঘস্থায়ী হবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

শিল্পীর দ্বিতীয় জন্ম

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

॥ ১ ॥

আন্দাজ বছর পনেরো-ষোলো আগে আশ্চর্য সম্ভাবনা-প্রদীপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিক-মধ্যবিত্ত সম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাদে নেমে এসেছিলেন 'ধরা বাঁধা জীবনে', 'ভেজালে'র চরম নৈরাজ্যে আর অবশেষে 'হলুদপোড়া'র পটভূমিতে—যেখানে মানুষের গোপন হিংসা আর অবচেতন আত্মপীড়ন বাস্তব-অবাস্তব, লৌকিক-অলৌকিকের এক বিষাক্ত অন্ধকারে অবলীন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমস্ত রচনা আঙ্গিক ও উপলব্ধির দিক থেকে প্রায় সুর-রিয়্যালিজ্‌মের জগতে গিয়ে পৌঁছেছিল। অথচ সুররিয়্যালিস্টিক সৃষ্টির গভীরতা ও শিল্পসুষমা তাতে ছিল না।

এর পরেই স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারত: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর যা দেবার ছিল তা তিনি নিঃশেষে দিয়েছেন; তাঁর যা বক্তব্য ছিল—তা সম্পূর্ণভাবে বলা হয়ে গেছে। এখন কেবল পুরোনো অবক্ষয়ী বিষয়বস্তু নিয়ে আত্মানুবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই তাঁর। সে সময় একজন সমালোচক স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছিলেন, মানিক-সাহিত্যে

আর সহজ উৎসার নেই--তাঁর প্রেরণাভূমি মরুমৃত—এখন 'তাঁর লেখায় ঘামের ফোঁটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে'।

এই 'ল্যাকোনিক' উক্তি রূঢ় কিন্তু অত্যুক্তি নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগণ্য অনুরাগীর দল এই অসীম শক্তিমান শিল্পীর অপমৃত্যু অনুভব করছিলেন গভীর বেদনা এবং গভীরতর ক্ষোভের সঙ্গে।

কোনো দেশে, কোনো কালেই নেতিবাদী সাহিত্যিক শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন না। শুধু আত্মিক নয়—কখনো কখনো তাঁর কায়িক-মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। অস্বীকার, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করতে করতে শেষ পর্যন্ত জীবনবিতৃষ্ণ শিল্পীর নিজের ওপরেই অশ্রদ্ধা আসে, তারপর একদা অনন্ত হতাশায় তাঁর কলম থমকে দাঁড়ায়। আর তা সত্ত্বেও তিনি যদি লিখে চলেন, তা হলে সে-লেখা যেমন তাঁব গৌরব বাড়ায় না, তেমনি পাঠকের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের রূপ নিয়েই দেখা দেয়।

নেতিবাদী শিল্পীর শূন্যময় পরিণাম পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কারো-কারোর অপ্রত্যাশিত গোত্রান্তর ঘটে। যৌবনে পুরোপুরি মনুনিষিদ্ধ-পন্থায় জীবন অতিবাহিত করে বিগলিতনখদন্ত পেন্‌শনভোগী যেমন পাড়ার হরিসভার পরমোৎসাহী সদস্যে পরিণত হন—এই জাতীয় শিল্পীরাও তেমনি একদা কীটদষ্ট ব্যাঘ্রচর্ম ফেলে দিয়ে নামাবলী আশ্রয় করে থাকেন। প্রথম দিকের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা পরিশেষে যখন মন্থর এবং ভোঁতা হয়ে আসে, লেখক যখন আবিষ্কার করেন যে

বিশ্বসংসারের দেউলেপনা উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে তিনি নিজেই দেউলে হয়ে গেছেন, তখন তাঁদের কাউকে-কাউকে অধ্যাত্মবাদ অথবা বেদান্ত-দর্শনেব ভক্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। তখন অল্‌ডাস-হাক্‌স্‌লির মতো লেখকও 'The Genius and the Goddess' লিখে হালে পানি পান না। তখন মনে হয়—ওটা হাক্‌স্‌লির ভস্মস্তূপ—ওর মধ্য থেকে তাঁর আর ফিনিক্‌সের মতো পুনরুদয় সম্ভব নয়।

এ হল একদলের কথা। কিন্তু এঁদের সহযাত্রী আর একটি গোষ্ঠীর কথাও স্মরণীয়। এই গোষ্ঠীতে বার্নার্ড শ আছেন এবং আর একটু ব্যাপকভাবে দেখলে টমাস হার্ডিকেও এই পংক্তিতেই নির্দেশ করা যায়। 'মিসেস্ ওয়ারেন্‌স্ প্রোফেশ্যন' কিংবা 'জুড্ দি অব্‌স্‌কিয়োর'-এর ভেতরেও নগ্ন ক্ষুরধার জীবন-সমালোচনা। বার্নার্ড শ ব্যঙ্গের বিদ্যুদ্‌ঘাতে জর্জরিত করেছেন দেশ-কাল-সভ্যতাকে আর হার্ডি দুঃখের অশ্রুক্ষরণে এবং বেদনার তিক্ত রসে মানুষকে অভিষিক্ত করেছেন।

তবু বার্নার্ড শর স্থান পৃথিবীর মহত্তম শিল্পীগোষ্ঠীতে, তবু টমাস হার্ডি ইংরেজি সাহিত্যে অনন্য ব্যক্তিত্ব; এই গোষ্ঠীর আদি-নায়কত্বে অমর মহিমা লাভ করেছেন আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ জোনাথান্ সুইফ্‌ট্, শ-র মন্ত্রগুরু স্যামুয়েল বাটলার, আরো পূর্বগামী বিশ্রুত সার্ভেন্‌টিস্। মানস-কন্যা 'এম্মা'র বাসনা ও বিকৃতির সহমর্মিতায় তাই গুস্তাভ ফ্লোবের সুপ্রতিষ্ঠ; স্তাঁধালের 'লাল-কালো'র নায়ক জুলিয়ানের

ছিন্নমুণ্ড যখন গিলোটিনের কুঠারঘাতে গড়িয়ে পড়ে—তখন তার মধ্যেও আমরা দেখি এক নিত্যকালীন সত্য আর সৌন্দর্যের অভীপ্সা রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে যাচ্ছে। এ দুঃখবাদ বটে, কিন্তু শূন্যবাদ নয়। এই সব সাহিত্যিকের দল জীবনের সমস্ত বেদনা, ব্যর্থতা, পরাজয়, অপঘাত আর অপমৃত্যুকে দেখেছেন—মানুষের পরমতম লজ্জার কুটিল-সর্পিল নেপথ্যকে তাঁরা উদ্ভাসিত করেছেন ; কিন্তু তার ভেতর দিয়ে তাঁরা এ-কথাও বলে গেছেন সমাজ ও মনুষ্যত্বের এই পরাভূত পরিণতিই শেষ কথা নয়। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, আরো গভীর জীবন আছে, আরো পূর্ণ মানবতা আছে, আরো সার্থক সমাজ-চেতনা আছে। ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌মের প্রাচীপ্রান্তেই হোক অথবা সামগ্রিক শুভচেতনার বোধিতেই হোক—মানুষের জন্যে এক অলক্ষ্য অরুণোদয় সম্ভাবিত হচ্ছে আগামী ইতিহাসে। সেই পরম লগ্ন যতক্ষণ সমাগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারেব বিভীষিকায় যাতে অপবুদ্ধিতাড়িত আত্মহননের মধ্যে আমরা নিঃশেষিত না হই, সেইজন্যেই তাঁদেব এই সতর্কতার সংকেত।

আপাত জীবন-বিমুখতা সত্ত্বেও গভীরতম জীবন-সংসক্তিই তাঁদের শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা। আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই আমরা দেখিযেছি তারাশঙ্করের মানস-বিশৃঙ্খলা ক্রমশ অধ্যাত্ম-বুদ্ধির বকযন্ত্রে পরিস্রুত হয়েও সুগভীর মানবপ্রেমে মণ্ডিত হয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠক যখন তাঁর সম্পর্কে

সমস্ত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও এক নতুন অধ্যায়ে পদক্ষেপ করতে দেখা গেল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান গল্প 'আত্মহত্যার অধিকারের' মধ্যেই এর একটি অঙ্কুর-সম্ভাবনা নিহিত ছিল। দুঃসহতম দুঃখের পঞ্চম অঙ্কেও জীবন-নাটকের যবনিকা পড়ে না—তার চাইতেও অকল্পনীয় দুঃখের প্রেক্ষণপটে প্রাণ এবং প্রিয়জনের প্রতি মমতায় শূন্য-রিক্ত হৃদয় অকস্মাৎ একটি পূর্ণ মধুচক্রের মতো টলটল করে ওঠে। তাই মধ্যবিত্ত মনোযন্ত্রণার কুম্ভীপাকে জর্জরিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আবিষ্কার করলেন, আত্মবিকলন আর কূটৈষণার পঙ্কক্লিন্ন এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তরেখার বাইরে মানুষের জন্যে আরও অনেক বড় যন্ত্রণা, অনেক ভয়ঙ্কর শোষণ, অনেক বীভৎস নরক অপেক্ষা করছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেইদিনই অনুভব করেছিলেন, তাঁর নীলমণির মতোই 'আত্মহত্যার অধিকার' তাঁর নেই—বেদনার দিগন্ত কোথাও সমাপ্তির বৃতিতে এসে লুপ্তিলাভ করে নি; দিগন্তের পরে আরো দিগন্ত—তা অনিঃশেষ।

কিন্তু সম্যক্ বোধির জন্যে আরো দীর্ঘকাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপেক্ষা করতে হয়েছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমারু বিমানের গর্জন শুনতে শুনতে, মন্বন্তরের কঙ্কাল-করোটি পায়ের তলায় দলিত করে আরো বহুদূরবিস্তীর্ণ পথের অতিক্রমা অবশিষ্ট ছিল তাঁর জন্যে।

দ্বিতীয় জন্মের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি।

॥ ২ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগে' বলেছেন 'মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে "কল্লোল" ডিঙিয়ে "বিচিত্রা"য় চলে এসেছে—পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে "কল্লোলেরই" কুলবর্ধন'।

সিদ্ধান্তটি আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য। বস্তুত 'কল্লোলে'র সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য আছে তিক্ততায়, মানস গহনের অনুসন্ধানে এবং যুগোচিত সমাজ-জিজ্ঞাসায়। কিন্তু এ ছাড়া আরো কিছু বেশিও তাঁর মধ্যে আছে। সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল স্বতন্ত্রই নন—একক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র—এবং তাঁর অঙ্কের প্রতি প্রীতি নিজের জবানবন্দিতেই তিনি ঘোষণা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের এই সূত্রটি অপ্রাসঙ্গিক নয় "ছেলেবেলা থেকে 'কেন ?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করবার আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ।" (গল্প লেখার গল্প) এই 'কেন'র উত্তর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিনই আঙ্কিকের স্থির-মস্তিষ্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন—তন্নতন্ন করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই তাঁর দৃষ্টি মোহ- এবং -পূর্বসংস্কারমুক্ত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা পরিণামে যে ভয়াবহ সত্যই অনাবৃত হোক

না কেন তাকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। ভাবজীবী 'কল্লোলীয়'দের সঙ্গে বিজ্ঞানজীবী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইখানেই প্রভেদ এবং সে প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

মানিকের মানসিকতা গঠনে 'কল্লোলের' প্রভাব অনেকখানিই পড়েছিল, কিন্তু তা যুক্তিহীন ভাবে নয়; তাঁর বিজ্ঞানী-বুদ্ধির সাহায্যে কল্লোলীয় আন্দোলনকে তিনি বিচারের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছিলেন—নতুনত্বের চাঞ্চল্য বা আবেগের উন্মাদনা তাঁকে প্ররোচিত করতে পারে নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে হ্যামস্থন গোর্কির পাঠশালায়" যেতে চেয়েছেন, তাঁর মতো সে-যুগের অনেকের কাছেই হয়তো গোর্কি-হ্যামস্থন, কস্‌মো হ্যামিল্টন-আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার, এলিয়ট-বোদ্‌লেইর একার্থক ছিলেন; যে-কোনো প্রতিবাদ, যে-কোনো জ্বালা কিংবা যে-কোনো তিক্ততাকেই তাঁরা সমধর্মী বলে মনে করতেন। ন্যাচারালিজ্‌মের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট রিয়্যালিজ্‌মের পার্থক্য তাঁদের কাছে স্পষ্ট-চিহ্নে ধরা পড়ে নি। কিন্তু অঙ্কবিদের প্রমাণসাপেক্ষ বিচার এত সহজেই অভিভূত হল না। এ-সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

"হ্যামসুনের দু-একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেন বাবুর এই চিঠি পড়ে গোর্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই। মনে আছে, 'মাদার' পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেন বাবু মেলাবেন কি করে ?

আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু **ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে ?**”*

এ বক্তব্য সহজ, স্বাভাবিক এবং লেখকের চরিত্রোচিত। যুক্তিবাদী মন এর মধ্যে সজাগ সুতীক্ষ্ণ হয়ে আছে। ওই একই প্রবন্ধ থেকে কল্লোলীদের সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যসার উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁকে বোঝবার জন্যে এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে :

“আশা করেছিলাম অনেক কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা, আমাকে তীব্র ভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব-সংঘাত আসে নি। বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসে নি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক্ ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোম্যান্টিক্ প্রেম বাতিল হয় নি, ওই একই রোমান্স্ শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।”

এই উক্তি থেকে সুস্পষ্ট যে কল্লোলীয় লেখকদের সঙ্গে সাধর্ম্য দূরে থাক, বরং ‘কল্লোল-কালিকলম-ধূপছায়ার’ ধারা

*‘সাহিত্য করার আগে’। (বড় হরফ আমার)

সম্পর্কে তাঁর একটা পরিচ্ছন্ন বিরূপতাই ছিল। আঙ্গিক নির্ভুলতায় নিয়ন্ত্রিত-দৃষ্টিমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাব এবং ভাবনার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতাকেই স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'কল্লোল-কালিকলমে' বিদ্রোহের যে সম্ভাবনা— জীবননিষ্ঠ বস্তুবাদী যে যুগ-সাহিত্যের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল-- শেষ পর্যন্ত তা রোম্যান্টিক্ ভাবালুতার জলাভূমিতে এসেই আলেয়াবিভ্রান্ত পথচারীর মতো সমাপ্তিলাভ করল। ক্ষুব্ধ নিরাশ মানিক বন্দোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করলেন: "নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতাব আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তবরূপ দেখেছি— সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের—সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?"

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই কলম ধরতে হল।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে-- কোন্ আদর্শ কী বিশিষ্ট mission নিয়ে মানিক সাহিত্যে পদক্ষেপ করেছিলেন। 'কল্লোলীয়দের' রোম্যান্টিক্ মোহাবরণ ছিন্ন করে বাস্তবের কঠিন মাটিতে পরিক্রমাই তাঁর সংকল্প—রিয়্যালিজ্‌মের দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে জীবনের সত্যস্বরূপ আবিষ্কার করাই তাঁর ব্রত। অনেক দিন আগে কল্লোলীদের প্রিয় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আগামী যুগের জীবন-সাধককে আহ্বান করে বলে-ছিলেন:

"কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বলিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্নমূর্তিখানি ?
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো ;
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ-ফেরানো গুঁড়ো ?
খেলোয়াড়ী প্যাঁচ দূরে গিয়ে ক'বে তীরের মতন কথা,
বর্ম ভেদিয়া মর্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্মব্যথা ?"

যতীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট সেই শিল্পী হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যে কি ভাবে বাজি রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন, সে উপাদেয় কাহিনীটি বাঙালি পাঠকমাত্রেরই জানা। কিন্তু 'অতসী মামী' গল্পটিকে লেখক নিজে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন নি—তাঁর ভাষায় "এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মন-ভোলানো গল্প" যে একান্ত সংকোচেরই ব্যাপার—এ-কথা অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। লেখকের বিনয়ও একে বলা যায় না। বাঁশি বাজাতে বাজাতে যতীন মামার গলা দিয়ে রক্ত ওঠা, ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু, তারপরে প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুর রাত্রিতে অতসী মামীর সেখানে বাঁশি বাজাতে যাওয়া—এর মধ্যে রোম্যান্টিক্ কল্পনার যত চমৎকারিত্বই থাক—এ গল্প লেখবার জন্যে সাহিত্যে তিনি আসেন নি। এ কাজ করবার জন্যে লোকের অভাব ঘটত না—সেজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়োজন ছিল না। বাজি রেখে আকস্মিক-ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত না হলেও নিজের কথা বলবার

জন্যে তিনি আসতেনই—হয়তো আমাদের আরো দু-এক বছর বেশি অপেক্ষা করতে হত।

যুক্তিবাদী মন, বস্তুনিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে দেখা দিলেন। সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করবার বহু পূর্ব থেকেই তাঁর মনে এর জন্যে যে দীর্ঘ নেপথ্য-প্রস্তুতি চলছিল—তিনি নিজেই সে-কথা বারে বারে বলেছেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরবার যে স্বাভাবিক সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন - সেই সুযোগকে তিনি নিজেই আরো প্রসারিত করে নিয়েছিলেন; মধ্যবিত্ত জীবনচর্যার ঘনিষ্ঠ পরিচিতির মধ্যেই তিনি সীমায়িত থাকেন নি জীবন-জিজ্ঞাসু এই চঞ্চল কিশোর পদ্মানদীর মাঝিদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নীচু তলার মানুষের সঙ্গেও মর্মসম্বন্ধ রচনা করে নিয়েছিলেন। একদিকে মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং আত্মবঞ্চনা—অন্যদিকে আদিমপ্রায় মানবতার বলিষ্ঠ হিংস্র জীবনোল্লাস তাঁর দৃষ্টির বৃত্ত রচনা করেছিল।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে নির্মোহ বুদ্ধি যাত্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই রিয়্যালিস্ট্ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে দিল।

পূর্বগামী কোনো লেখকের পরোক্ষ প্রভাব যদি তাঁর ওপর পড়ে থাকে, তা হলে দুজনের নাম অনুমান করা যায়। একজন জগদীশ গুপ্ত, অপরজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মনোবিকলনের জটিলতার মধ্য দিয়ে জীবন-রহস্য সন্ধানে এ-যুগের অন্যতম প্রথম পথিকৃৎ জগদীশ গুপ্ত। একদিকে

রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা—এ দুইয়ের মাঝখানে জগদীশ গুপ্ত অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে মনোলোকের গহনে প্রায়-নিঃসঙ্গ যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। কথনকৌশলের দুর্বলতায় তাঁর গল্পগুলো সব সময়ে মহিমান্বিত হয় নি—কিন্তু তা হলেও তিনি এক নতুন সম্ভাবনার আগল খুলে দিয়েছিলেন। আর রোম্যান্টিক্ আবেশ সত্ত্বেও শৈলজানন্দ বাংলা গল্পের ভৌগোলিক সীমান্তরেখাকে অনেকখানি প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন: এনেছিলেন কয়লাকুঠির মানুষদের, সাহিত্যিক ব্রাত্যদের, এনেছিলেন তাদের বিষমাখানো 'কাঁড় বাঁশকে' আর এনেছিলেন তাদের উগ্র অমার্জিত কামনাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বিষয়বস্তুও তাই প্রথম থেকেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

"নোংরা রোম্যান্টিক্ ন্যাকামি"র প্রতি স্থিরপ্রতিষ্ঠিত বিরূপতা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনসত্যের অসঙ্কোচ উন্মোচনে ব্রতী হলেন। ভাবালুতা বৈজ্ঞানিকের সর্বথা বর্জনীয়— তিনিও সে-সম্পর্কে প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে থাকলেন।

জীবন-জ্যামিতির পাতা খুলে আঙ্কিক লেখক প্রথম পর্বে 'সম্পাদ্যের' জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন। এই-ই জীবন? এই তার রূপ? এই তার পরিণাম? 'সরীসৃপ?' 'সমুদ্রের স্বাদ?' 'মহাকালের জটার জট?' 'চোর?' 'প্রাগৈতিহাসিক?' 'আত্মহত্যার অধিকার?'

কিন্তু জিজ্ঞাসাই তাঁর শেষ কথা নয়। সম্পাত্তের সমাধান আছে দ্বিতীয় পর্বে। এ-সমাধান অপরিহার্যভাবেই এসেছে। 'মেলে না উত্তর'—এই কবিসান্ত্বনায় বৈজ্ঞানিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো খুশি থাকতে পারে না। মহাকালের জটা যতই জটিল হোক—তাঁকে তার গ্রন্থিমোচন করতেই হবে।

তাই সাহিত্যিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সাম্যবাদী পরিণতি, অনেকের কাছে অবাঞ্ছিত হলেও, অনিবার্য ছিল। এই জন্যই তাঁর আঙ্কিক সত্তাকে এত বেশি করে উল্লেখ করতে হল।

রোম্যান্ সৈন্য সিরাকিউজ অধিকার করবার সময় যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল—সেই নরমেধের বর্বরতম বলি হলেন পৃথিবীর সর্বনন্দিত অঙ্কবিৎ আর্কিমিডিস্। ঘাতক তাঁর ঘরে ঢুকেছে—কিন্তু আর্কিমিডিস্ তখনও তাঁর জ্যামিতিক রেখার মধ্যে নিমগ্নচিত্ত। বুকের সামনে উদ্যত তলোয়ার দেখেও তিনি কেবল বিরক্তিভরে বলেছিলেন: "Don't disturb my circles!"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও উপেক্ষার ঘাতকের কাছেই আত্মবলি দিয়েছেন। কিন্তু তখনও আর্কিমিডিসের মতোই নিজের সত্যে অবিচল থেকে বলেছেন "Don't disturb my circles!"

কিন্তু সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

॥ ৩ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রথমাংশ হল উদ্ঘাটনের যুগ। পূর্বব্যবহৃত উপমাটির জের টেনে বলতে পারি 'সম্পাদ্যে'র উপস্থাপনা পর্ব। স্থিরচিত্ত বৈজ্ঞানিকের জীবনজিজ্ঞাসা। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের 'material and spiritual' সংকটের অপাবরণ।

মধ্যবিত্তের মধ্যগত যে অন্তঃসারশূন্যতা ও গ্লানি তার সম্পর্কে কল্লোলীয়দেরও কোনো মোহ ছিল না। তাঁরাও একে যথাসাধ্য অভিব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন—এর মর্মনিহিত অসারতা আর আত্মবঞ্চনাকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন নানা ভাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমারের গল্পে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু তা হলেও তাঁদের মধ্যে যে পরিমাণে আত্মধিক্কার ছিল, সে পরিমাণে আত্মসমালোচনা ছিল না। এই আত্মনিরীক্ষার জন্যে যে নিরাসক্তি অপরিহার্য, তা তাঁদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি। তাই 'পুন্নাম' কিংবা 'দুইবার রাজা'য় লেখকদের বেদনার্ত ব্যক্তিত্বই উপস্থিত—সাহিত্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা অপক্ষপাত সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

আর, বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শান্ত ও নির্লিপ্ত বিচারক। তাই তাঁর গল্প পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি যেন বাইরে থেকে এসে দাঁড়িয়েছেন; মনে হয়, একজন ইয়োরোপীয় যেন আচ্ছন্নতাবর্জিত বুদ্ধির আলোকে আমাদের

সমাজ-জীবনকে বিশ্লেষণ করে চলেছে—আর সেই বিশ্লেষণের ভেতর একটা বক্রতা সব সময়ে সজাগ হয়ে আছে।

বিচারকের শান্ত-নিরাসক্তির সঙ্গে বিদ্রূপ-বক্রতার মিলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব গল্প মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত সম্পর্কে অসাধারণ নির্মম। তাঁর প্রথম দিকের গল্প 'বৃহত্তর মহত্তরে' মমতাদি বিকারজর্জরিত দাম্পত্য জীবনের নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে মুক্তির সন্ধানে। কিন্তু বেরিয়ে এসেও অভ্যাসের হাত থেকে—নারীত্বের সংস্কারের কাছ থেকে তার মানসিক পূর্ণ মুক্তি মেলে নি। ব্যক্তি-সম্বন্ধেরও "স্নেহ, প্রেম, মমতা, মানুষের নাগপাশ—নাগপাশে মূর্ছাব তন্দ্রা"-কে ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে "সে আবার স্নেহ অস্বীকার করবার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে" বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় তবুও সেই বীভৎস পতিদেবতা এবং অপজাত সন্তানদের প্রতি গৃহশুকের অহিফেন-নেশা তার কাটে নি।

মমতাদি ইব্‌সনের নোরা নয়—কিন্তু তার জীবন-তাৎপর্যকেও উপেক্ষা করা চলে না। তরুণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই এই নারীর দর্পণে তাঁর 'কেন'কে খুঁজে পেয়েছেন। 'বৃহত্তর মহত্তর' ঠিক গল্প হয়ে ওঠে নি—একেবারে শেষের কয়েকটি পংক্তি ছাড়া একে সংলাপিত প্রবন্ধ বলা চলে। কিন্তু এর মধ্যে লেখকেব যুক্তিবাদ এবং সামাজিক অন্বেষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

'বৃহত্তর মহত্তরেরই' আর এক রূপ 'সমুদ্রের স্বাদ'। মমতাদির সমস্যা বাস্তব এবং তীক্ষ্ণ—'সমুদ্রের স্বাদে' নীলার সমুদ্রস্বপ্ন

রূপকের আকারে দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সংসারে নীলার মতো অনেক মেয়েই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে—যে সমুদ্র মুক্তি—যা মহাজীবন, খাঁচার পাখি নীল আকাশে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখে; কিন্তু অনিবার্যভাবেই সেই সমুদ্র জীবনের বর্ণবৈচিত্র্যহীন, সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ গণ্ডির হতাশা ও বেদনায় পরিণাম লাভ করে —প্রাত্যহিক দিনচর্যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত "আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।"

নীলার মতো অনেক কিশোরীর স্বপ্ন ও সমাপ্তির সাংকেতিক কাহিনী 'সমুদ্রের স্বাদ।' গল্পটির রূপক-ব্যঞ্জনায় কবিচিত্তের স্পর্শ আছে; অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংকেতিকতাব নিপুণ শিল্পী হলেও কাব্যব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তাঁর উৎসাহ নেই। তাই আরো স্পষ্ট প্রত্যক্ষতায় তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে।

সমাজের অন্তরচারী ক্রূরতা ও হিংস্রতার উন্মোচনে 'আততায়ী' গল্পটি প্রায় চরম রূপ ধরেছে। গল্পের আরম্ভেই লেখক শাস্ত্রমতে আততায়ীর সংজ্ঞা দিয়ে তারপর নির্ভুল নিষ্ঠুরতায় বন্ধুত্বের স্বরূপ দেখিয়েছেন। কেমন করে এক বন্ধু অপব বন্ধুর সবনাশ করে, তাকে অন্ধ করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকেও আয়ত্ত করছে, শীতল মস্তিষ্কে নরহত্যা করবার ভঙ্গিতে সে-কাহিনী বর্ণনা করেছেন লেখক। এই গল্প পড়তে পড়তে

আমরা যেন ফক্‌নারের ‘স্যাংচুয়ারির’ নাগরিক-সংস্করণে পৌঁছে যাই—নীতি-ধর্ম-বিবেক-করুণাহীন এক প্রেতলোকে গিয়ে উপস্থিত হই। এতদিনের ন্যায়-ধর্ম-সংসার-সমাজের শেষ পরিণতি যদি এ-ই হয়, তা হলে ক্রন্দনবাদী দার্শনিকদের নির্দেশ অনুসরণে মানুষের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না!

এই বীভৎস ক্রূরতা ও পাশবতার লীলা সব চাইতে প্রকট হয়ে উঠেছে ‘সরীসৃপ’ গল্পে। দীর্ঘবিস্তৃত, সুলিখিত ও ইঙ্গিততীক্ষ্ণ এই গল্পে ‘স্যাংচুয়ারি’ আরো বিকৃত, আরো স্পষ্টরেখ, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বনমালীকে আয়ত্ত করবার জন্যে দুই বিধবা বোন চারু এবং পরীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে—সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার কদর্য-কুটিলতার দ্বিতীয় নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ। ‘সরীসৃপ’ যেন নরকের কাহিনী। হিংসার যন্ত্রণায় পরীকে কলেরার জীবাণু খাইয়ে চারুর হত্যার চেষ্টা, পরীর স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জ লালসা—অন্তর্জ্বালায় নিজের সন্তানের গলা টিপে ধরা, অবিশ্বাস্য মিথ্যার বেসাতি, চারুর ছেলেকে নিশ্চিত মৃত্যুতে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি বনমালীর শয়তানসুলভ নির্বিকল্প কঠিনতা—বোধ হয় গল্পের স্রষ্টাকেও পর্যন্ত আতঙ্কিত করে তুলেছিল! তাই মানুষের এই বিষজর্জর সরীসৃপবিবর থেকে তিনি নিজেই যেন মুক্তিলাভ করতে চেয়েছেন: “ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল।

মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।”

‘সিঁড়ি’ গল্পেও আর এক দিক থেকে ‘সরীসৃপেরই’ অনুরণন শোনা যায়। এই গল্পের বাড়িওলা মানবও মূলত বনমালীরই স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ‘সরীসৃপে’র শেষের পংক্তিগুলিতে তবু লেখকের তিক্ততা খানিকটা আভাসিত হয়েছে—কিন্তু ‘সিঁড়ি’র স্রষ্টা জল্লাদের মতো যান্ত্রিক এবং নৈর্ব্যক্তিক। অক্ষম নিরুপায় ভাড়াটিয়ার কাজ থেকে টাকা পাওয়ার উপায় না থাকলে তার স্ত্রী-কন্যার দেহের মাধ্যমে বাড়িওয়ালার ক্ষতিপূরণ আদায় করবার কুৎসিত কাহিনী বিদেশী সাহিত্যেও পড়েছি—কিন্তু মিতভাষণ ও ইঙ্গিতময়তায় এই গল্পে যে পাশবতার বিন্যাস ঘটেছে তার তুলনা দুর্লভ। তবে ‘সরীসৃপে’র পরীর চাইতে ‘সিঁড়ি’র খোঁড়া মেয়ে ইতি শেষ মুহূর্তে কিছুটা আত্ম-সম্মানের পরিচয় দিয়েছে—সুধার পরিণামের মধ্য দিয়ে ইতির বিদ্রোহ—সম্ভবত সাময়িক বিদ্রোহ—অন্তত একটা নিরুপায় ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ এই গল্পে রেখে যেতে পেরেছে।

মনোগহনের তামসপথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গল্প সাহিত্যের বিশিষ্টতম যাত্রী। তাঁর সাহিত্যিক প্রস্তুতি-পর্বেই তিনি ফ্রয়েডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন—ইউরোপীয় সাহিত্যেরও সন্ধানী পাঠক ছিলেন তিনি। ফ্রয়েডের সংকেত অনুসরণে মানসিক সর্পিলতার পথে জীবন-রহস্যের মূল কেন্দ্র অনুসন্ধান করা প্রথম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান

ধারায় পরিণত হয়েছিল। অন্তর্লোকের এই "Dark avenue" পরিক্রমা করতে করতে অবচেতন ও অচেতন কত বিচিত্র-ভয়ঙ্কর শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে—কত অবদমনের নখদন্তশাণিত করালরূপ দৃষ্টিপ্রদীপে আলোকিত হয়েছে, প্রাণস্রোতে অগ্রসর 'আইস্‌বার্গের' লৌকিক ও সামাজিক সত্তার অন্তরালে কী অলক্ষ্য বিরাটের সন্ধান মিলেছে। এ-যুগের সাহিত্যে জেম্‌স্‌ জয়েসের এপিক উপন্যাস 'ইউলিসিস' তার সব চাইতে বড় দলিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'কেন'র উত্তর খুঁজতে এই মূলের দিকে যাত্রা করেছেন—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় জীবনরহস্যের সূক্ষ্মতম সূত্রগুলিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'সরীসৃপ' 'সিঁড়ি'র স্থূল পাশবিকতা ছাড়াও তাঁর আরো অনেক ক-টি গল্প আছে—যেখানে এই গুহানিহিত সূক্ষ্ম রহস্যের চমকপ্রদ উন্মোচন মেলে। বাংলা সাহিত্যে এই ধারার সূচনা করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এরা পূর্ণ শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেছে।

এই পর্যায়ী গল্পগুলির মধ্যে স্মরণীয় 'ভূমিকম্প', 'ফাঁসি', 'বিপত্নীক', 'মহাকালের জটার জট' ও 'টিকটিকি'। একেবারে প্রথম দিকের লেখা এবং "প্রবাসী" পত্রিকার পাঠকদের ভোটে পুরস্কৃত 'চাপা আগুন' গল্পটিও মনে পড়তে পারে বস্তুত সেখান থেকেই এই জাতীয় গল্পের সূচনা হয়েছে।

'ভূমিকম্পে'র নায়ক প্রসন্নের মানসিক ব্যাধি কোনো মনো-বিজ্ঞানী চিকিৎসকের ক্লিনিকের বিষয়বস্তু। আকস্মিক নৈশ

ভূমিকম্পের তাড়নায় নিদ্রোত্থিত প্রসন্নের মনে যে অদ্ভুত আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল- পরবর্তীকালে তা fixation-এ পর্যবসিত হয়েছে। সেই ভূমিকম্পের পর থেকে এক একটা ছোট বড় কারণে হঠাৎ প্রসন্নের "মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দা ঢুলিতে আরম্ভ করে।·· দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথার ঝাঁকুনি দিয়া পর্দা সরানো যায় না, অতীত-জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মতো ঢুলিতে থাকে।" এই পর্দার সঙ্গে আর একটা নতুন উপসর্গ এসে উপস্থিত হয়েছে— একবার মাদ্রাজ যাওয়ার পথে তার সামান্য কিছু জিনিসপত্র চুরি যাওয়ার পর থেকেই "প্রত্যেক রাত্রে সমস্ত রাত্রিব জন্য নিজের অচেতন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া" তার ঘুম ভেঙে যেতে থাকে। একটি যে অপরটির পরিপূরক, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

গল্পটি মানস-ব্যাধির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এবং যে-কথা আগেই বলেছি, গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'ক্লিনিক'ই এর যথাযোগ্য নিরীক্ষার স্থান। লেখকের কৃতিত্ব এটিকে সাহিত্যভা· করায়— আশ্চর্য নৈপুণ্যেব সঙ্গে এটিকে উপস্থাপনা করার মধ্যে। অনুরূপ মনোব্যাধিব বিস্তৃত উদাহবণ পাওয়া যায় "চতুষ্কোণ" উপন্যাসের রাজকুমাবের চরিত্রে।

"ফাঁসি" গল্পে নরহত্যাব দায়ে অভিযুক্ত গণপতির সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পাওয়া এবং ঘরে ফিরে আসবার পরে তার স্ত্রী রমার আত্মহত্যা একটি স্বাভাবিক অথচ চমকপ্রদ সমাপ্তি লাভ করেছে। গণপতি পুরুষ—চারদিকের সমস্ত সংশয়, বিষ আর

বিদ্রূপের মধ্য দিয়েও আবার হয়তো সে সহজ জীবনে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু রমার মনে যে জটিলতার গ্রন্থি পড়েছে— তার মোচন সে করবে কী উপায়ে ? এই দৈনন্দিন আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে বাইরের জগৎ প্রতিদিন ইন্ধন দেবে—মনের দিক থেকে রমা কখনো স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে না—এই অসহ্য দ্বিমুখী পীড়নের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। তাই গণপতি যে ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে ঘরে ফিবে এসেছে—সেই ফাঁসিব দড়িই শেষ পর্যন্ত বেছে নিতে হয়েছে রমাকে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে 'ফাঁসি' একাধারে সার্থক এবং করুণ।

'বিপত্নীকের' মনোরহস্য আরো অপূর্ব—এবং গল্পটি লেখকেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনারূপে নির্ণীত হওয়ার দাবি রাখে। সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত স্বামীর কাছ থেকে বর্বর অপমানে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে স্ত্রী সবিতা। কিছুক্ষণের জন্য স্বামী অনুতপ্ত হয়েছে—কিন্তু গল্পের মূল বক্তব্য সেখানে নয়। স্ত্রীর আত্মহননের আকস্মিকতাকে অতিক্রম করে যে প্রশ্ন স্বামীকে বিভ্রান্ত করছে, তা হল এই : "সবিতা কি করে কড়িকাঠে তার মৃত্যুর আয়োজন করল, এ কথাটা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে ?···দড়িটা হুকে সে আটকাল কি করে ?"

স্বামীর এই মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত মনে হতে পারে—কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠনের ওপর বিভিন্ন ঘটনার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে ; আপাত-বিচারে যাকে সব চাইতে প্রধান ব্যাপার বলে মনে হয়—তাকে ছাপিয়ে হয়তো

একটা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস মনকে বিদ্ধ করতে থাকে, ডার্বি স্যুইপে লাখ টাকা লাভের আনন্দ একটা পেন্‌সিলকাটা ছুরি হারানোর কাছে ম্লান হয়ে যায়। এ গল্পেও তারই একই আশ্চর্য সংকেত। সবিতার মৃত্যুর চাইতেও তার স্বামীর কাছে এই ক্ষোভটাই প্রধান হয়ে উঠেছে যে তার একান্ত পরিচিত, অনুকম্পার যোগ্য স্ত্রী অন্তত একটি ক্ষেত্রে তাকে পরাজিত করেছে—দড়িটা অত উঁচুতে ছুকে সে আটকাল কি করে—এ প্রশ্নের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তার শান্তি নেই!

মনোজগতের এই সমস্ত বিচিত্র পরিক্রমায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখকের মহত্তম মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু মৌলিকতায় নয়, বস্তুবৈচিত্র্যে নয়, জীবন দর্শনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে নয়—রচনারীতির দিক থেকেও এরা আদর্শ ছোটগল্প রূপে নির্ধারিত হওয়ার যোগ্য। ইঙ্গিতগূঢ় ভাষা, অসাধারণ সংযম, এক-একটি উদ্ধৃতিযোগ্য পংক্তিতে এক-একটি অভিনব সত্যের বিদ্যুদ্বিকাশ—ছোটগল্পের সফলতম আঙ্গিকরূপে নির্দিষ্ট হতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজনের স্টাইল লক্ষ্য করলেই আধুনিক বাংলা গল্পরীতির তিনটি মৌলিক উপাদানকে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা যেন অবনীন্দ্রনাথের ছবি—মিতরেখার সঙ্গে রঙের কোমল সৌন্দর্যবিস্তার, তারাশঙ্করের রচনা যেন তিব্বতীয় তান্ত্রিক শিল্পকলা—সৌন্দর্যের সঙ্গে বীভৎসতার দ্বৈতরাগিণী, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিউবিস্ট

গোত্রের শিল্পী—যেখানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সমাজসচেতন শিল্পবুদ্ধি জটিল অথচ নির্ভুল যুগমনকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে ! (এই জন্যেই হয়তো পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবাদর্শে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পিকাসো'র সহযাত্রী হয়েছেন।)

আর রচনারীতির এই অপরূপতার জন্যেই 'মহাকালের জটার জট' একটা বিশিষ্ট সাহিত্যবাদ বহন করে। স্টাইলের কারুনৈপুণ্য ভুলে গেলে গল্পটির ভেতরে আঙ্কিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফর্মুলা প্রয়োগের চমৎকার একটি নিদর্শন পাওয়া যাবে। গল্পটির কোনো পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই—গর্ভবতী বধূ সুলতাকে স্বল্পমাত্রায় প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি চরিত্রের জটিলতা সামান্য সামান্য ইঙ্গিতের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আসলে সমস্ত গল্পটিই যেন যাবতীয় ফ্রয়েডীয় কম্প্লেক্সের নমুনা—ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স—ইলেক্ট্রা কম্প্লেক্স—যেখানে যা কিছু আছে, সুচিত্রা-সতীশ-হেমন্ত-সরমা-মনোরমার মধ্যে তার সব কিছু ব্যঞ্জিত করবার চেষ্টা হয়েছে। সাহিত্যিকের চাইতে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকাই এখানে মুখ্য এবং গল্পটি সেদিক থেকে যান্ত্রিক। তবু স্টাইলের যোজনা-কৌশলে এদের মধ্যেও অখণ্ডতার রস পাওয়া যায় : "আকাশ-গঙ্গার মতো শূন্য বাহিয়া ঝরিতে ঝরিতে এমনি একটি প্রাচীন মহাকালের জটায় একটি সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের কয়েক মুহূর্তব্যাপী সংক্ষিপ্ত অভিনয়" আমাদের রোমাঞ্চিত করে।

মানস জগতের গূঢ়গহন পরিক্রমায় লেখক যত দূরেই অগ্রসর হোন না কেন—এই জটিল পথে পাঠকের মন অন্তত যাতে তাঁকে অনুসরণ করতে পারে, এজন্যে তাঁর কিছু কিছু সংকেত রেখে যাওয়া উচিত। এই সংকেত যদি দুর্বোধ্য হয়, তা হলে সাহিত্যে 'Communication' বলে যে শব্দটি আছে তার কোনো অর্থই হয় না—সেখানে যেন লেখক নিজের প্রয়োজনে প্রায় সাংকেতিক ভাষায় 'নোট্' করে চলেন—তাঁর সৃষ্টির ওপরে পাঠকের কোনো অধিকার থাকে না। হেমিংওয়ে কিংবা ফক্‌নারের গল্প পড়তে গিয়ে, মিলার কিংবা কক্‌তুর উপন্যাসের মর্মগ্রহণ উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে এই অস্বস্তি আমরা অনেকেই অনুভব করে থাকি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো গল্প 'Communication'-এর কার্পণ্যের জন্যে কখনো কখনো অস্পষ্ট, কখনো বা একেবারেই ঝাপসা হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাস' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। সূত্রের অভাবে লেখাটিকে একেবারে অর্থহীন বলে মনে হয়। লেখকের আত্মস্মৃতিমূলক 'টিকটিকি' উপাদেয় ইঙ্গিতময় গল্প। কিন্তু টিকটিকির সাংকেতিকতার সঙ্গে জ্যোতিষার্ণবের বিচিত্র কম্‌প্লেক্সের মিশ্রণ যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে—তার রূপটাকে আর একটু কম obscure করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না; বরং অনূঢ়া প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে টিকটিকির সম্পর্ক ও জ্যোতিষার্ণবের মনে তার প্রতিক্রিয়াজাত fixation, দ্বিতীয়া স্ত্রী রেবতী ও কিশোর উত্তম পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে তার মনোভাব—টিকটিকির

'চারচোখা' হওয়ার মধ্যে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার কূট উল্লাস—এগুলিকে আর একটু স্পষ্টরেখ করলে গল্পটি আরো সমৃদ্ধ হত বলেই মনে হয়। তির্যক রীতি এবং ইঙ্গিতময়তা এ যুগের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই—কিন্তু বহু উচ্চারিত এবং নিত্যকালীন সত্য সাহিত্যের 'সহিতত্ব'কেও একেবারে বিস্মৃত হওয়া কোনো সহৃদয় লেখকেরই উচিত নয়।

'হলুদপোড়া' সম্পর্কেও এ সংশয় জাগে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতেন? তাঁর জীবন-দৃষ্টি এবং সাহিত্যধারা তার বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে। অথচ 'হলুদপোড়া' গল্পে ধীরেন যখন এক অদ্ভুত সন্ধ্যায় ভূতগ্রস্তের মতো রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে, কুঞ্জ গুণীর কাঁচা হলুদ পোড়ার প্রভাবে যখন সে জবাব দেয় 'আমি বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রাকে আমি খুন করেছি'—তখন প্রেতপ্রত্যয়ের মধ্যেই গল্পটির নিষ্পত্তি হতে চায়। পরিবেশ-রচনার অসামান্য নৈপুণ্য এই প্রত্যয়কে দৃঢ়তর করে।

বস্তুত, গল্পটি মানসিক বিসর্পিলতার একটি ভয়াল নিদর্শন। ধীরেনের শোকার্ত মন, আত্যন্তিক ভাবপ্রবণতা, "জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের" একটা অসুস্থ আবেগ—তাকে মন-স্তাত্ত্বিকভাবেই প্রেতাশ্রিত করে তুলেছে। গ্রাম-জীবনের সাধারণ কুসংস্কারও এ ব্যাপারে অনেকখানি আনুকূল্য করেছে বলা যায়। কিন্তু ভৌতিকতার পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখকের কৃতিত্ব গল্পটিকে বিকেন্দ্রিত করেছে—'Communication'-এর

'False indication' উদ্দিষ্ট সিদ্ধান্তের বিপরীতেই পাঠকের মনকে পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণতিকে বোঝবার জন্যে দুটি গল্পকে বিশেষভাবে নির্দেশ করবার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। এই দুটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প—বাংলা সাহিত্যেও এদের স্থায়ী স্বীকৃতি। একটি 'প্রাগৈতিহাসিক', অপরটি 'আত্মহত্যার অধিকার'।

গল্প দুটির পরিচয় অনাবশ্যক। প্রভাতকুমারের প্রসঙ্গ আলোচনায় আমি বলেছি, মপাসাঁর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদিক থেকে শৈল্পিক সাধর্ম্য আছে। সমকালীন ফ্রান্সের উচ্চ-বিত্ত এবং নাগরিক জীবনের চূড়ান্ত অবক্ষয়কে মপাসাঁ তীব্রতম ভাবে আক্রমণ করেছেন—ঊর্ধ্বতলচারী মসিয়েঁ এবং মাদমোয়া-জেল্‌দের সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা ও বিদ্রূপ বোল্‌তের-এর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু যেখানেই সাধারণ শ্রমিক ও মাটির মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে—সেইখানেই 'Simon's Pa'র স্নিগ্ধতায় অথবা 'Vagabond'-এর করুণায় লেখক অপরূপ হয়ে উঠেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও গাল্পিক মপাসাঁ এবং কবি বায়রনের সঙ্গে অনুরূপ সহধর্মিতা আছে। 'কুষ্ঠ রোগীর বউ' কিংবা 'শহরতলী'তে উচ্চবিত্ত আঘাতে আঘাতে যতই জর্জরিত হোক—আদিম মানুষ সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাত সুস্পষ্ট। অন্তত নিচুতলার জীবনে এমন একটা সুস্থ বলিষ্ঠতার সন্ধান তিনি পেয়েছেন—যা আত্মবঞ্চনার মর্ফিয়া দিয়ে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করে না—

কূট কামনার রন্ধ্রপথে সরীসৃপের মতো বিলসিত হয় না—যা শাণিত ছুরিকে সামাজিক সৌজন্যের পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করে না। তাই রাজকুমারের মতো মধ্যবিত্ত নায়কের কোনো পরিণাম নেই, কিন্তু হোসেন মিঞার উপনিবেশে কুবের আর কপিলা এক অনিশ্চিত অথচ অপূর্ব জীবনের দিকে যাত্রা করে।

'প্রাগৈতিহাসিক'-এ ডাকাত ভিখুর ক্রম-পরিণাম নির্ভুল বাস্তবতা এবং অসামান্য বলিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। ভিখুর কাহিনী যতই বীভৎস হোক চরিত্রটির প্রতি লেখকের একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আগাগোড়াই অনুভব করা যায়। তাই দুর্দান্ত ডাকাতের ডান হাতটা বল্লমের ঘায়ে মরা-ডালের মতো শুকিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে অপরাজিত। "যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আনিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে" তা প্রাগৈতিহাসিক হলেও সে 'সরীসৃপের' চাইতে অনেক বেশি কাম্য—যেখানে সুন্দরবনে "মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা আশ্রয় লইয়াছে।"

এই কারণেই 'চোর' গল্পে চোর মধুর পাপকে ছাপিয়ে আরো বড় পাপ করেছে রাখালের ছেলে পান্নাবাবু। মধুকে চুরি করতে হয় বাঁচার প্রয়োজনে—আর রাখালের ছেলে তার স্ত্রী কাদুকে অপহরণ করে লালসার তাড়নায়। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি এই গল্পে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : "জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।" উপরতলার মানুষ আর মাটিঘেঁষা মানুষের চৌর্যবৃত্তির পার্থক্য এই গল্পে অতি প্রত্যক্ষভাবে ধরা দিয়েছে। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ পরিণতির একটি প্রচ্ছন্ন আভাস 'প্রাগৈতিহাসিক' বা 'চোর' জাতীয় গল্পে সংকেতিত হয়েছে।

আভাস আছে আর একটি গল্পে। সে 'আত্মহত্যার অধিকার'।

এই গল্পে একটি কঠিন জিজ্ঞাস্য আছে। কতখানি দুর্গতি, কী-পরিমাণ গ্লানি, কতটা মনুষ্যত্বের অবমাননা আর আত্ম-ধিক্কারের কোন্ চূড়ান্ত লজ্জা মানুষকে আত্মহত্যায় অনুপ্রেরিত করতে পারে? গল্পের নায়ক নীলমণি ভেবেছিল, অসহ্য দৈন্য আর পরাভবের লজ্জার মধ্য দিয়ে সে আত্মহত্যার অধিকার অর্জন করেছে। দুর্যোগের রাত্রে দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত নীলমণি ভাবছে : 'সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাত দুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে।' আর বাড়ির অবাঞ্ছিত পোষ্য লোমহীন নির্জীব নেড়ী কুকুরটাকে অকারণে মারতে গিয়ে ওই মৃত্যুমুখ প্রাণীটার ভেতরে নিজেকেই সে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছে : "ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথিঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর

লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।”

নীলমণি ভেবেছিল, এর পরে তার বেঁচে থাকবার সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু গল্পের শেষে সে আবিষ্কার করল, দুঃখের কোনো সীমা নেই—যন্ত্রণার কোনো অন্ত নেই - বেঁচে থেকেও মানুষকে যে কুৎসিত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তার কোনো পরিমাণ নেই। শেষের পরেও শেষ আছে ; গ্লানির সীমান্তরেখার পরেও আছে আর এক দিগন্ত। সুতরাং জীবনের সংগ্রাম কখনো ফুরিয়ে যায় না- তা কোনোদিন ফুরিয়ে যাওয়ার নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গাণিতিক মন নিয়ে সমস্যার পর সমস্যা তুলে ধরছিলেন, সমাধানের ইঙ্গিত কাছে এসেও যেন সম্পূর্ণ করে ধরা দিচ্ছিল না। যেন নিজেকে নিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে উঠছিলেন—সমালোচক তাঁর রচনায় দেখতে পাচ্ছিলেন ‘ঘামের ফোঁটা’।

কিন্তু তারপরে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেখা দিল মন্বন্তর ; মুহূর্তে অনেক মিথ্যার আবরণ সরে গেল হিংস্র লোভের কল্পনাতীত প্রতিযোগিতায় বেরিয়ে এল এই সমাজ এই রাজনীতি এই জীবনচর্যার আসল চেহারা। আর্কিমিডিসের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও চকিতে নিজের অন্বেষিত সত্যের সন্ধান পেয়ে বলে উঠলেন : ‘পেয়েছি – এইবার পেয়েছি !’

॥ ৪ ॥

কী পেলেন তিনি ?

'প্রতিবিম্ব' 'চিন্তামণি'র পথ বেয়ে—'ছোট বকুলপুর' পার হয়ে, যা 'সোনার চেয়ে দামী' তাকেই খুঁজে পেলেন 'মাটিঘেঁষা মানুষের' কাছে—'হলুদনদী সবুজবনের' ধারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্যবাদী মন্ত্রদীক্ষাকে আকস্মিক বলে মনে করবার হেতু নেই। আগেই দেখেছি, তাঁর মধ্যে এর অংকুর-সংকেত পূর্বাপর নিহিত ছিল। মধ্যবিত্তের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের কোনো মোহই নেই; ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে অপজাত এই "Coupon Cutter" গোষ্ঠীটি যে ঐতিহাসিক নিয়মেই আত্মবিবোধে জর্জরিত হবে এবং ক্রমে ক্রমে তুনির্বাব বিনষ্টিব পথে অগ্রসর হবে—এই সত্যটি গ্রহণ করতে তাঁব খুব বেশি দ্বিধার প্রয়োজন হয় নি। স্বাভাবিক প্রবণতায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মধ্যবিত্তের প্রতি যে বিদ্বেষ ও বিরূপতা তিনি লালন করছিলেন মার্ক্স্বাদ তাকে যুক্তি ও হৃদয়গত সমর্থন দিয়েছিল। আর এই মধ্যবিত্তের সম্বন্ধসূত্রে ধনতন্ত্রের স্বরূপটিও যে তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন—তার স্বাক্ষর এর আগেই ফুটে উঠেছিল তাঁর "সহরতলী" উপন্যাসে সত্যপ্রিয় আর জ্যোতির্ময়ের উপাখ্যানের মাধ্যমে।

তাই 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের সন্ধিক্ষণটি পার হয়ে সাম্যবাদের প্রতীতিভূমিতে অবতরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে সহজ মোহমুক্ত মন আর মাটির মানুষের প্রতি প্রবণতায় তিনি গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে অবলীলায় নেমে এসেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক অন্বেষা তাঁর উদ্দিষ্ট সত্যের সন্ধান পেল।

এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে এই পর্বে তাঁর ছোটগল্পের যে-পরিমাণে প্রাচুর্য পাওয়া যায়—সে-পরিমাণে সমৃদ্ধি মেলে না। তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান দুটি কারণ হল, প্রথমত তেভাগা আন্দোলন, রসিদ আলী দিবস বা অন্যান্য সাময়িক উত্তেজনার যে তরঙ্গ পর পর এসে তাঁর স্নায়ুকে চঞ্চল করে রেখেছে—তার মধ্যে স্রষ্টাসুলভ প্রয়োজনীয় detachment আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ; দ্বিতীয়ত একটা নতুন সত্য লাভের উন্মাদনা—তার প্রয়োগ ও পরীক্ষা তাঁর অনেক গল্পেই ফর্মূলার প্রাধান্য এনে ফেলেছে স্থায়ী-সাহিত্য হিসেবে তাদের মূল্য হয়তো খুব বেশি নয়।

কিন্তু এর চাইতে বড় কথা আছে। তাঁর আদর্শের প্রয়োজনে 'লেখনিক'কে 'সৈনিক' হতে হবে এ সত্য তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে-দিনের আরো দু-চারজনের মতো শুধু হাওয়ার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জনপ্রিয় হতে চান নি—'শৌখিন মজদুরি' তিনি করেন নি, তাঁর গোত্রান্তরের

মধ্যে ফাঁকি ছিল না। বরং যে ভাবাবেগ-সম্পর্কে তাঁর শান্ত-বিচারক মন এতকাল প্রতিবাদ করেই এসেছে– নতুন মন্ত্রদীক্ষার প্রভাবে তিনি সেই ভাবাবেগকেই কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই পর্যায়ের গল্পগুলির সাহিত্যিক মূল্য যা-ই থাক, দেশপ্রেমের যদি কোনো দাম থাকে—আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি যদি থাকে—তা হলে বাংলা দেশ সংগ্রামী-লেখনিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনোদিনই ভুলতে পারবে না।

তাঁর দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর গল্পগুলি সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা মনে আসে। আজকের দিনে কোনো পাঠক যদি এই সব গল্প একসঙ্গে পড়তে বসেন তা হলে তিনি অনুভব করবেন, এরা যেন বিচ্ছিন্ন কয়েকটি রচনা নয়: খণ্ডিতভাবে লিখিত হয়েও এরা এক অখণ্ডতার রস বহন করছে। যুগের সংকট আর অনিশ্চয়তায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো এপিক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে লেখক তাদের জুড়ে নেবার সময় পান নি– কতগুলি ছিন্ন পত্র ইতস্তত বাতাসে উড়ে চলেছে। এই গল্পগুলি এককভাবে খণ্ডিত পত্র—সামগ্রিকভাবে সমকালীন বাংলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক মহাসংহিতা!

তবু এই পর্বেও তিনি আশ্চর্য কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছেন। প্রচার বা মতবাদের ঊর্ধ্বে সাহিত্যের নিত্যভূমিতে তারা অবস্থিত হয়েছে।

এই গল্পগুলি প্রধানত ত্রিমুখী। উপরতলার স্বরূপ-নির্ণয়, মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশ ও মোহমুক্তি এবং জনগণের সংগ্রাম।

উচ্চতলচারীদের চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে তুটি গল্পের বিশেষ উল্লেখ করা যায়। একটি 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', অপরটি 'চিকিৎসা'।

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে সামান্য চাকুরে মাখন যুদ্ধের দৌলতে কালোবাজারী কণ্ট্রাক্ট্ নিয়ে বড়োলোক হয়েছে। তার উন্নতির প্রধান অবলম্বন হচ্ছেন দাস সাহেব। দাসের প্রতি মাখনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—তাঁরই অনুগ্রহে সে দামি মোটরে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়। কিন্তু এ-কথা মাখন জানে না যে এই তুষ্ট রাহুগ্রাসের মধ্যে ঢুকলে আর পরিত্রাণ নেই—দাস সাহেবের ঘুষের ক্ষুধা তুর্নিবার এবং শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষুধার আগুনে নিজের স্ত্রী সুশীলাকে পর্যন্ত তার সঁপে দিতে হয়। কিন্তু তার জন্যে যে চিত্তবৈকল্য ঘটে তা একান্তই সাময়িক এবং পরক্ষণেই সুশীলাকে দাসের খপ্পরে ছেড়ে দিয়ে সোয়া লাখ টাকার কণ্ট্রাক্টের উত্তেজনায় মাখন পাগলের মতো ছোটে, "ড্রাইভারকে বলে, জোরসে চালাও! জোরসে!"

যুদ্ধকালীন লোভবিকৃত মধ্যবিত্ত এবং দাস সাহেব শ্রেণীর উচ্চচর চরিত্রের exposition-এ গল্পটি বীভৎস বাস্তবতার ফোটাগ্রাফিক নিদর্শন। মাখনের মানসিক অধঃপতনের মধ্যেই গল্পের আসল ট্র্যাজেডী সন্নিহিত। ত্রিশঙ্কু মধ্যজীবীর মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি এই গল্পটিতে শুনতে পাওয়া যায়।

'চিকিৎসা' গল্পে ভূপেশের ড্রাইভার জীবনের চোখে নিম্নবিত্ত মানুষের দুর্ভাগ্য আর দুর্ভাবনার পাশাপাশি উচ্চবিত্তের সর্বাত্মক পচনের প্রতিফলন আছে। গাড়ি চালাতে গিয়ে একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ হওয়ার পর থেকে ড্রাইভার জীবনের যে বিচিত্র মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে, বড়লোকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপের বিষ তার সেই ব্যাধির যন্ত্রণাকে আরো অসহ্য করে তুলছে। শেষ পর্যন্ত ভূপেশের বিধবা মেয়ে মোহিনীর কুৎসিত প্রস্তাব এবং একশো টাকার ঘুষকে পেছনে ফেলে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে জীবন—এ নইলে তার ব্যাধির চিকিৎসা হবে না—তার বাঁচবার উপায় নেই।

গল্পটি তিক্ত হলেও নিষ্ঠুর সত্য। বড়লোকের সান্নিধ্যে এসে, তাদের বিষাক্ত স্পর্শে খেটে-খাওয়া মানুষ জীবন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে গল্পের এই জ্বালা ভোলবার নয়। 'চিকিৎসা' আমাদের 'সরীসৃপ' যুগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বড়দিন' গল্পের শিকার কাহিনীতে কিংবা 'এ।।ধিকে'র জ্যোতির্ময়ের চরিত্রেও এই মনোভঙ্গিরই বিভিন্ন রূপায়ণ।

মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক প্রণষ্টি যুদ্ধ ও কালোবাজারের পরিপ্রেক্ষিতে চমৎকারভাবে বহু গল্পে ফুটিয়েছেন লেখক। 'বিবেক' গল্পের ঘনশ্যাম যখন বড়লোক বন্ধুর চুরিকরা ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির গোপন অনুপ্রেরণায় নিজের বিবেককে নিরঙ্কুশ করে, অথচ সেই সঙ্গে দরিদ্র, নিরুপায়, পরম হিতকামী সমগোত্রীয় বন্ধুর মনিব্যাগ চুরি করতে তার বাধে না—তখন মধ্যস্বত্বভোগীর

স্ববিরোধের রূপটি চূড়ান্তভাবেই অভিব্যক্ত হয়। মন্বন্তরের পটভূমিতে এই আত্মবিরোধের বিয়োগান্ত মূর্তি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ফুটেছে 'নমুনা' গল্পে। নিরন্ন মৃত্যুমুখী কেশব চক্রবর্তী জানে, কালাচাঁদ তার মেয়ে শৈলকে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধকালীন নরকে লম্পটদের বিকৃত ক্ষুধার মুখে সমর্পণ করে দিতে—কিন্তু তবু সে অন্তিম চেষ্টায় শালগ্রামশিলা সাক্ষী রেখে শৈলকে কালাচাঁদের হাতে সমর্পণ করে তার ধর্মপত্নীরূপে। কালাচাঁদের লুপ্তপ্রায় বিবেক কিছুক্ষণের জন্যে সজাগ হয়ে ওঠে আকণ্ঠ পাপের মধ্যে নিমগ্ন থেকেও সে শৈলকে কিছুক্ষণের জন্যে রক্ষা করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারপর :

"বাড়ীতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে-করা স্ত্রীর ঘরে

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ হবার পরে, মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।" এই 'নমুনা'য় শরীর শিউরে ওঠে— মনে হয় এতদিনের ধর্ম-সমাজ-সংস্কার রাত্রির স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এর চাইতে হয়তো

সুন্দরবনে ফিরে যাওয়াই ভালো— এর চেয়ে পশুর সান্নিধ্যও অনেক বেশি আমাদের বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বিনাশের পরেই নবজন্ম আছে। মার্কস্‌বাদ বলে, ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্তের দৃষ্টি যতই ঊর্ধ্বলোকের দিকে অসম্ভবের দুরাশায় নিবদ্ধ থাক, শেষ পর্যন্ত ক্রান্তিলগ্নে এই মূলহীন অপসঞ্জাত শ্রেণীকে নিচের মাটিতেই আশ্রয় নিতে হবে--সামিল হতে হবে সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে। সেই ইতিহাসসিদ্ধ পরিণতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন 'সখী', 'ঘর করলাম বাহির', 'সবার আগে চাই' ও 'রক্ত নোনতা' ইত্যাদি গল্পে।

'রক্ত নোনতা' প্রতিরোধ আন্দোলনের কাহিনী। সর্বাত্মক সংগ্রামের পটভূমিতে মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক স্বার্থপরতা তো দূরে থাক -তার ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রেমের সম্বন্ধ পর্যন্ত আত্মত্যাগের মহিমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই পুলিসের গুলিতে নিজের ছেলে মারা গেছে বলেই ডাক্তার দাশ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ে নি— আপন সন্তানের রক্তাক্ত শবদেহকে সম্মুখে ফেলে রেখেই ডাক্তার অন্যান্য আহতদের ক্ষত পরিচর্যায় শান্তচিত্তে মনোনিবেশ করেছে। তার এখন অনেক দায়িত্ব -অনেককে তাঁর বাঁচাতে হবে -নিজ সন্তানের জন্যে শোকাভিভূত হওয়ার তার সময় নেই।

কিন্তু মধ্যবিত্তের গোত্রান্তরের কাহিনী লেখক যা-ই লিখুন-- কৃষাণ ও শ্রমিক সম্পর্কিত গল্পগুলির তুলনায় এরা যেন কেমন দীপ্তিহীন। এদের মধ্যে লেখকের রাজনৈতিক ভাবধারার

প্রয়োগ আছে, পরিচ্ছন্ন সজাগ বুদ্ধির পরিচয় আছে, তবুও মনে হয় এরা যেন ফর্মূলা অনুযায়ীই তৈরি হয়েছে; প্রাণের উত্তাপও এগুলিতে তেমনভাবে অনুভব করা যায় না। সম্ভবত, মধ্যবিত্ত সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক অপ্রীতি গোত্রবদলের মধ্য দিয়েও অপসৃত হয় নি—অবচেতনভাবে তা তাঁর সমস্ত সদিচ্ছাকে প্রভাবিত করেছে। তাই এই কৃত্রিম ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীকে তিনি সহানুভূতি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, শান্তি আন্দোলন, প্রতিরোধ আন্দোলন, পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তার অনুভাব—সব কিছুর সাহায্যে এর সংগ্রামী চেতনাকে আবিষ্কার করবার প্রয়াসও পেয়েছেন; তবু তা সত্ত্বেও এই সমাজ তাঁর বুদ্ধির অনুমোদনই পেয়েছে—হৃদয়গত মমত্বে স্নিগ্ধ হতে পারে নি।

অথচ, সেই মমত্বে সার্থক হয়েছে 'কংক্রিট' গল্পের দোলাচল-চিত্ত রঘু। পোঁছাবাবুর ঘুষের টাকা তাকে শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত করতে পারে নি, বেন্দার মদের নেশা তাকে হতচেতন করে নি, রানীর লালসার নাগপাশ তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাই "সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে সেটি এক মুহূর্তের বেশি লুকিয়ে রাখবার কথা" সে আর ভাবতেও পারছে না। সেই গভীর প্রীতি আর আশ্চর্য স্বজনত্ববোধে উদ্ভাসিত হয়েছে 'শিল্পী' গল্পের মদন :

"চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে বাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সূতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে?"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পগুলির আঙ্গিকেও লক্ষণীয় বিশেষত্ব আছে। ভাষা-পদ্ধতিতে, 'ডিটেল্‌স্‌'-এর নির্ভুলতায়, পরিবেশ রচনায় লেখক যেন সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এই একাত্মতার ফলে গল্পগুলি আশ্চর্য বাস্তব— রিয়্যালিজ্‌ম্‌, সোস্যালিস্ট্‌ রিয়্যালিজ্‌মের দিক থেকে এরা বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

তাই 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' পড়তে গিয়ে দিবাকর আর আন্নার সঙ্গে লেখক অভিন্নসত্ত হয়ে যান। গণ-সংগ্রাম এবং পুলিস-গোয়েন্দাতন্ত্রের এই অপূর্ব গল্পটির সূচনা, গতি ও পরিণতির সঙ্গে কেবল লেখকই অগ্রসর হন না— আমাদেরও একচিত্ত করে দেন। 'নীচু চোখের' মানুষগুলি এই বাস্তবতার প্রভাবে রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'সশস্ত্র প্রহরী'র যে মদন বাবুদের মদের উদ্দাম আসরে বন্দুক কাঁধে পাহারা দেয়, অথচ নিজের ঘরের বেড়া ভেঙে শেয়ালে শিশু সন্তানকে চুরি করে নিয়ে গেলে তাকে বাঁচাতে পারে না— সেই মদনের জীবনের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ সমমর্মিতায় আমাদের চিত্তকে ক্ষত-বিক্ষত করে। 'মেজাজ' গল্পের ভৈরব নিজের ধর্ষিতা স্ত্রীর অবমাননার প্রতিশোধ নেবার জন্যে মহারুদ্রের মতো যে ভয়াল প্রতীক্ষা করতে থাকে— তার সঙ্গে আমাদের শিরাস্নায়ুও প্রতীক্ষমাণ হয়ে উঠে।

গণসংগ্রামের কাহিনীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সত্যিই সৈনিকব্রত গ্রহণ করেছেন। অসামান্য গল্প 'হারানের নাত-জামাই'-এ তাঁর কলম তলোয়ারের মতো জ্বলে উঠেছে। গল্পটির

পরিকল্পনা যেমন অভিনব—তেম্নি বাস্তব। বিপ্লবী পলাতক কর্মী ভুবনকে বাঁচাবার জন্যে ময়নার মা যে বিচিত্র উপায়ের উদ্ভাবনা করেছে—তাতে তেভাগা সংগ্রামের শক্তি ও ব্যাপকতা সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু গল্পের মূল সৌন্দর্য সেখানে নেই। হারানের আসল নাতজামাই জগমোহনের পরিবর্তন এবং গল্পের নাটকীয় মুহূর্তে তার বজ্রগর্জিত আত্মপ্রকাশ মন্মথর পরাজয়ের চাইতেও মহত্তর তাৎপর্য বহন করে। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে যে 'বৃহত্তর মহত্তরের' উদ্দেশ্যে তাঁর জীবন-সমীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল এইখানে এসে, বহুবাঞ্ছিত মীমাংসার মধ্যে সেই সন্ধিৎসার সমাপ্তি ঘটেছে।

অকালমৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাগৈতিহাসিক যে শক্তিকে বিশ্বাস করেছিলেন, জীবনের সমাপ্তি অধ্যায়ে সেই শক্তির অপরিমিত সম্ভাবনা ও সর্বোত্তম সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন। 'চাষীর মেয়ে' তারেই সোনালি ফসল বয়ে আনছিল।

কিন্তু সে ফসল তোলা শেষ হল না; তাঁর বিচ্ছিন্ন পাণ্ডু-লিপির পত্র সংগ্রহ ও গ্রন্থবন্ধন অসম্পূর্ণই রইল। তার আগেই তিনি চলে গেলেন।

সাহিত্যের এই দ্বিতীয় পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি কেবল নীতি প্রচার করেছেন? তাঁর অধিকাংশ গল্প কি মানবরসে মণ্ডিত হয় নি? তাঁর যুদ্ধোত্তর সাহিত্য কি তাঁর ব্যর্থতা?

যে-কোনো যুদ্ধ—মানবতা-বিনাশী যে-কোনো হিংস্রতার উল্লাসই যে পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীর মননে ও কল্পনায় কী সংকট

ঘনিয়ে আনে—সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। দার্শনিক এবং সাহিত্যিকদের ওপরেই এর আঘাত সব চাইতে বেশি করে পড়ে। প্রথম এবং দ্বিতীয়—এই দুটি যুদ্ধই অগণিত শিল্পী-সাহিত্যিককে 'Waste Land'-এর পোড়ো-জমিতে পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে গেছে। তাঁদের একটা প্রধানাংশই বুদ্ধি ও চিন্তার বিভ্রান্তিতে ধর্ম বা অনুরূপ কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেন পৃথিবীর ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে কোনো ঐশ্বরিক গিরি-কন্দরে আশ্রয় পেতে চান। A. C. Wards তাঁর বিখ্যাত Twentieth Century Literature (1901-1950)-এর ভূমিকায় বলছেন :

"The common view of the war as a vast crime imposed upon mankind by man, a crime to be combated by plodding endurance, was qualified by a minority who saw the war as a consequence of Sin against God. In both World Wars, religion recaptured popular attention, and the revival of interest in religious literature between 1939 and 1945 was no new phenomenon ; nor was it unprecedented that some writers found it profitable to exploit this interest." (Page 19)

আজকের ইয়োরোপীয় ও মার্কিনী সাহিত্যে ধর্মের যে কী বিচিত্র পুনরুদয় হয়েছে—তার নিদর্শনের জন্যে বেশি দূরে

যাওয়ার দরকার নেই—ম্যারিয়্যাকের জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ দেবে। ক্যেমুর উপন্যাসেও এই 'Sin Eating' এবং অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও ধর্মমূলকতার সাহায্যে 'profitable exploitation' যে চলছে না—জোর করে সে-কথা কি আমরা বলতে পারি?

'Mental Clinic'-এর শিল্পী, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও অল্ডাস্ হাক্স্লি, ইভ্লীন ওয়া কিংবা গ্রাহাম গ্রীনের মতো সে পরিণতি ঘটতে পারত। তিনিও প্রায় সেই 'Vacuum'-এ পৌঁছেছিলেন- যার পরবর্তী পদক্ষেপই এই জীবনবিমুখ ছদ্ম-অধ্যাত্মবাদে নিয়ে যায়; কিন্তু সেখানে তিনি যথার্থ জীবনশিল্পীর মতো মনুষ্যত্ব ও বাস্তবতার ভিত্তিকে আশ্রয় করেছেন—সাম্যবাদের সপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। মানিকের রাজনৈতিক সাহিত্য স্থায়িত্ব লাভ করবে কিনা, তাব নির্ধারণ করবার আগে এই অধ্যাত্মপন্থী লেখকদের সম্পর্কে Wards-এর ভবিষ্যদ্বাণীই উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"A literature over-concerned with spiritual and moral maladies will at length become itself infected and perish, a certainty that must in the long run defeat the intellectualist tendency at the middle of the century to deride healthy literature, which is not a literature of false optimism nor of romantic sentimentalim."

তাই যদি হয়, তা হলে বরং মানিকের যা 'morbid self-abasement' তারই অপমৃত্যু ঘটবে; এবং তা-ই বেঁচে থাকবে যার মধ্যে তিনি সুস্থ, উজ্জ্বল, নির্ভয় এবং অপরাজেয় মানবতার বন্দনা গেয়েছেন।

তবু অনেক আলোচনা এই প্রসঙ্গে দেখা দেবে। শিল্প কী, তার উদ্দেশ্য কী, মহৎ শিল্পীর সংজ্ঞা কী, দেশ-কালের প্রতি শিল্পীর দায়িত্ব কতখানি—এই সব নানাবিধ প্রশ্ন-পরিক্রমা শেষ হলে তারপরেই হয়তো মানিকের এই সব গল্পের মূল্য অনেকখানি নির্ণীত হবে। অথবা এ-ও আশাবাদীর কথা হল। ব্যক্তিগত রুচি ও মনোভঙ্গি তর্কের মধ্য দিয়ে বদল হবার নয়। অতএব তাঁকেও অন্যান্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ-পর্যায় স্রষ্টাদের মতো প্রতীক্ষা করতে হবে সেই মোহমুক্ত নিরাবরণ দৃষ্টি চরম বিচারের জন্যে: যার নাম Posterity। সেখানে অনুকূল-প্রতিকূল কোনো গোষ্ঠীরই সমর্থন বা বিরূপতার কোনো দাম থাকবে না তার সাহিত্য কালজয়িতায় নিকষিত হবে।

সেই অনাগত সমালোচক যা-ই বলুন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন যেখানেই আসনলাভ করুন, এ কথা নিত্যকালের সত্য যে মানুষ, জীবন আর দেশকে যিনি ভালোবাসেন, যাঁর রচনায় মানব-কল্যাণের পুণ্যমন্ত্র আছে—তাঁকে কেউ সহজে ভুলতে পারে না। সমালোচকের বরমাল্য তিনি যদি না-ই পান, মানুষের প্রীতি তাঁর জন্যে সুচির-সঞ্চিত হয়ে রইল। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ইস্‌লামের ছাড়পত্রও তো এই।

পাব্‌লো নেরুদার ভাষায় আপাতত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এই-ই শেষ কথা :

"I feel no loneliness at night
in the obscurity of earth.
I am people, the innumerable people.
In my voice is the clear strength
that can traverse silence
and germinate in darkness.
Death, suffering, shadows, frost
Suddenly descend on the seed.
And the people seem entombed.
But corn returns to earth,
Its red implacable hands
thrust through silence
From death comes our rebirth."

(The Fugitive)

—

সপ্তম প্রসঙ্গ

ধানের শীষ ও শিশিরবিন্দু

[বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়]

॥ ১ ॥

প্রকৃতির প্রাণসত্তা শেলী যাকে "Life of life" বলেছেন, ইংরেজি রোম্যান্টিক্ কাব্যসাহিত্যে সে তার পূর্ণ মহিমা, পূর্ণতর সৌন্দর্যব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার প্রেরণাতেই কীট্সের 'Sweet Fancy'র সুদূরাভিসার, তারই দিকে তাকিয়ে বাস্তব-জীবনের ব্যথা-পাপ-ঘৃণার উদ্দেশে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের দীর্ঘশ্বাস : "What Man has made of Man ?"

রোম্যান্টিক্দের দৃষ্টিতে প্রকৃতির মর্মলক্ষ্মী এই যে ধরা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে তার প্রথম উদ্ভাস পাওয়া গেল বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতায়। বিহারীলালের প্রকৃতিও অবিমিশ্র নয় 'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা :'— নিসর্গশ্রী সেই সর্বাত্মিকারই অংশমাত্র। তাঁর শিষ্য রবীন্দ্রনাথের কাছেই প্রকৃতির বিশুদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ রূপ প্রতিভাত হল :

"চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পুব-বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে।
লাগল যে দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে।

যে বাণী ওই ধানের খেতে আকুল হল অঙ্কুরেতে
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায় সেই বাণী মোর সুরে আনে ॥"

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতোই প্রকৃতির রূপবিম্বে বিশ্বরূপসাগরের বার্তা পেলেন রবীন্দ্রনাথ---তার সঙ্গে মিশল উপনিষদের আনন্দ ও অমৃতরূপের অনুভূতি। জার্মান দার্শনিক শেলিংয়ের অনুভাবে নটরাজের ঋতুরঙ্গশালায় নাচের অঙ্গনে মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করলেন তিনি, গ্যয়টের মতোই 'সুরের গুরুর' কাছে নিলেন 'সুরের দীক্ষা'. নৈসর্গিক রূপের পঞ্চপ্রদীপে অপরূপের মন্দিরে আরতি সাজালেন।

নিসর্গানুভূতির এই রাবীন্দ্রিক সরণিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অগ্রসর।

রবীন্দ্রপ্রভাবিত পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-প্রেম আর নতুন কথা নয়---গদ্যে পদ্যে নানাভাবেই আমরা তার বহু বিচিত্র প্রকাশ দেখেছি। তা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণে স্বাতন্ত্র্য আছে। আর সে স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর।

বিস্ময়কর এই জন্যেই যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাবকালে বাংলা সাহিত্যের প্রধান স্রোত প্রবলবেগে অন্যখাতে বহমান। বিক্ষুব্ধ বিকেন্দ্রিত মধ্যজীবী মন তখন 'জীবন-বিধাতার' উদ্দেশ্যে প্রতিবাদে বজ্রগর্জিত, তখন আত্মনিরীক্ষার ফলে নিজেদের মধ্যে এলিয়টীয় "Hollw Men"-এর আবিষ্কার, সুনীতি-দুর্নীতির সীমান্তরেখা নির্ণয়ের জন্যে তখন সক্রোধ লেখনীসংগ্রাম। শরৎচন্দ্র তখন "শেষ প্রশ্নের"র উত্তর

খুঁজছেন, অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠছেন যোগক্ষেম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

সেই সময় আশ্চর্য "পথের পাঁচালী" নিয়ে বিভূতিভূষণের আশ্চর্যতর অভ্যুদয়।

একেবারে অন্য পৃথিবী থেকে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলেন তিনি। এত সমস্যা, এত সংঘাত, এমন জটিল আত্মবিকলন-এ-সবের বাইরেও যে এখনো অম্লান আনন্দের জগৎ আছে--এই সংগ্রামক্ষেত্রের ওপারে যে আত্মতৃপ্তির এক অপূর্ব "শ্যাংগ্রিলা" এখনো বিদ্যমান—"পথেব পাঁচালী" তারই বার্তা বহন করে আনল। আমাদের দগ্ধ দেহমন যেন জুড়িয়ে গেল। বাঙালি স্বস্তি ও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "এখনো অনেক রয়েছে বাকি।" দেশেব হৃদয়ক্ষেত্রে প্রীতিব আসনে বিভূতিভূষণ স্থির-প্রতিষ্ঠিত হলেন।

প্রকৃতিব ছায়াছত্রেব তলায় বসে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত শান্ত উদাস স্ববের গান শুনিয়ে গেছেন বিভূতিভূষণ। "পথের পাঁচালী"র ভোরের ভৈরব থেকে "ইছামতী"র সন্ধ্যার পূরবী পর্যন্ত তাঁর সুব শান্তি আব কারুণ্যে বিন্যস্ত। যুগচাঞ্চল্যের প্রভাব মধ্যে মধ্যে না পড়েছে তা নয়—কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যকে তা চঞ্চল করতে পারে নি। তাঁর এই অপূর্ব মানসিক প্রশান্তি ঈর্ষ্যাযোগ্য।

এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, সমকালীন জীবন-সমস্যার কিছু বলিষ্ঠ রূপায়ণ এবং অন্তরাবেগের সঙ্গে

দীপ্ত বুদ্ধির আরো কিছু সংযোগ ঘটলে বিভূতিভূষণের সাহিত্য আরো ব্যাপ্তি, আরো মাহাত্ম্য লাভ করত। কিন্তু বহুজনের ভিড়ের মধ্যেও বিভূতিভূষণ ধ্যানস্থ হতে জানেন--ধ্যানস্থ হওয়াই তাঁর ধর্ম। জীবনের জাহ্নবীধারা যুগের রুদ্রদহনে শুষ্কখাত—-কিন্তু তার মরুতুল্য নির্মমতার বিবৃতিতে তাঁর উৎসাহ নেই, তিনি জানেন সেই বালুবিস্তারের কোন্ জায়গাটি খনন করলে এক অঞ্জলি নির্মল স্বাদিষ্ট ভোগবতী জলের সন্ধান পাওয়া যাবে। আমি অন্যত্র বলেছি 'বিভূতিভূষণ কোকিলবৃত্ত' * তিনি 'আস্বাদন-পন্থী, বিশ্লেষণপন্থী নন। জীবনের ব্যাখ্যাতার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন নি, তিনি জীবনের উপভোক্তা।'

সেটুকুও কম লাভ নয়। তারাশঙ্করের রুদ্রতা, মানিকের বিজ্ঞান-বুদ্ধি বা প্রেমেন্দ্রের জীবন-তৃষা তাঁর মধ্যে নেই—কিন্তু এই তিনজনের মতোই জীবন এবং মানুষের প্রতি তাঁর অকৃপণ মমতা আছে। শরৎচন্দ্রের রীতিতে এই মমতা অশ্রুক্ষরিত -কিন্তু তাঁর হাতে "বিলাসী"র ব্যঙ্গের চাবুক কখনো লিকলিক করে ওঠে না। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে একদিকে একটি সরল পল্লীপ্রাণ মানুষ—সে সামাজিক, হৃদয়বান, পরদুঃখকাতর, সংযতেন্দ্রিয়; অন্যদিকে একটি ঘরভোলা মুগ্ধদৃষ্টি কিশোর—যার চোখের সামনে প্রকৃতি প্রতিদিন নব নব রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত করছে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাধনার মধ্য দিয়ে পরিশেষে যে বিশ্বরূপেশ্বরের সন্ধান পেয়েছে।

* সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ৫

বিভূতিভূষণের মানবিক মমত্ববোধ এবং প্রকৃতিচেতনার দুটি ধারা 'কুশল পাহাড়ী' গল্পটি (?)তে তাঁর মানস-পরিণতির একবেণীরূপে মিলিত হয়েছে। 'ভৈরব থানে'র সাধু প্রকৃতি সম্পর্কে বলছেন :

"কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি কবিই বটে তিনি।...তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।"

এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক :

"তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পাবে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ?
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে।"

আর দুঃখ-বেদনা-শোক-পীড়নের বন্ধনে বাঁধা মানুষের সম্পর্কে সাধুর বক্তব্য এই : "মানুষ মুক্ত। সেই নিজেকে বেঁধে রেখেছে।

সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত। সে মানুষ, সে মুক্ত।"

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'মুক্তি-বাঁধনে' এই তত্ত্বই শুনিয়েছেন :

"আমি ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।

সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তি বাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া।”

জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত সত্যোপলব্ধির চরম পর্যায়ে বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-পথেরই যাত্রী। তবে রবীন্দ্রনাথের পরিক্রমা কাব্য ও দর্শনের মহাকাশে, কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ লোকায়তিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকাচারী।

॥ ২ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক সূচনাও আকস্মিক। পার্থক্য এই, যে মানিক জানতেন তাঁকে একদিন লিখতেই হবে—তার জন্যে তাঁর নিঃশব্দ প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণ জানতেন না কোনোদিন তিনি লেখক হবেন—লেখক হওয়ার কোনো বাসনাও তাঁর ছিল না। “মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আশা নৈরাশ্য, হর্ষ, বিষাদ, ঋতুর পরিবর্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব—কত ছোট বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে”—মুগ্ধ চোখে এই সব দেখেই তাঁর দিন কেটে যেত।

কিন্তু যেত কি? নিজের গল্প লেখার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ বলেছেন, “এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে।

অতি সাধারণ পাখীর সাধারণ স্বরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে। অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবার হয়তো তারা অতি সাধারণ দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক।” বিভূতিভূষণ সেই শ্রেণীর মানুষ। তাই ডায়মণ্ড হারবার লাইনের কোনো এক পাড়াগাঁয়ের পাঁচুগোপালের ছেলেমানুষি খেয়াল তার সেই শিল্পিসত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছে মাত্র। পাঁচুগোপাল না এলেও বিভূতিভূষণকে জাগতেই হত—তাঁর মুক্তি ছিল না।

রূপরহস্যময় প্রকৃতি আর অতি চেনা সহজ সাধারণ মানুষ—বিভূতিভূষণের সাহিত্যের এই দুটিই মৌল উপকরণ। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি কোমল, সুন্দর ও শান্ত তার অন্তর্লোকে “light of light”-এর অবস্থিতি। তাঁর মানুষও নম্র, সুন্দর, সংযত। প্রায়-অরণ্যহীন ইয়োরোপের শিকারী যখন রাইফেল নিয়ে কঙ্গোর জঙ্গলে অথবা অ্যামাজনের মৃত্যু-অরণ্যে প্রবেশ করে—তখন প্রকৃতির সঙ্গে তার একটিমাত্র সম্পর্ক—তা প্রতিদ্বন্দ্বিতার; ‘হয় মারো নয় মরো’ এই তখন তার বীজমন্ত্র। রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্‌ থেকে মার্কিনী হেমিংওয়ে পর্যন্ত কেউ-ই সে-কথা ভুলতে পারেন না। ঘুমন্ত কিলিমঞ্জেরোর অম্লান তুষার অথবা যোজনব্যাপ্ত সুবিশাল তৃণভূমিতে সহজ স্বচ্ছন্দ জৈবলীলা কখনো কখনো তাঁদের সৌন্দর্য-চেতনাকে যে সঞ্জীবিত না করেছে তা নয়, কিন্তু তাঁদের হাতের রাইফেল সব সময়েই সতর্ক হয়ে থেকেছে। এই অরণ্যের মতোই সভ্য ইউরোপ-আমেরিকার

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মানুষের অন্তরক্ষেত্রে অ্যামাজনীয় অরণ্যের জটিলতা, সার্ত্রের ভাষায় ক্যেমুর 'Absurd Man'* তার ঐক-ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেই অরণ্যে পথভ্রষ্ট—মানস-বিকৃতি এক সামাজিক 'স্যাংচুয়ারি'তে সংগ্রাম-মুখর। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিতে এই রুদ্র বীভৎসতার স্থান নেই- হিংস্র অরণ্যে প্রবেশ করেও তাঁর মুগ্ধ চোখ দেখতে পায় "পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা পাপড়ি বিছানো···পার্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালি ফুল ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেছে।" মানুষ সম্পর্কেও তার অনুভূতি অনুরূপ। তাঁর সাহিত্যে ফক্‌নারেব Popey নেই, কোমুর Meursaultও নয়। আছে সিঁদুরচরণ, আছে হাজু, আছে মৌরীফুল সুশীলা, আছে অপু, আছে নারাণবাবু মাস্টার, আছে হাজারী ঠাকুর। তারা করমফুলের পাপড়ি, লোহাজালি লতা, ফলভারনত আমলকির শাখা কিংবা মুচুকুন্দ চাঁপা। বিশাল বাওয়াব গাছের ছায়া তাঁর সাহিত্যে নেই—হিংসক শ্বাপদের পদধ্বনি তাঁর লেখায় অনুপস্থিত।

কেবল একজনের সঙ্গে হয়তো তার মনের কিছু সাধর্ম্য আছে—তিনি W. H. Hudson যিনি 'The Purple Land' এবং 'Green Mansions'-এর স্রষ্টা। কিন্তু Hudson-এর মতো লেখক পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে ব্যতিক্রম—তার শান্তি ও

* Literary and Philosophical Essays—'Camus, The Outsider'—Jean-Paul Sartre.

ভাবতন্ময়তা এ-কালের কোনো দ্বিতীয় ইউরোপীয় লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না।

বিভূতিভূষণ গ্রামীণ কিন্তু গ্রাম্যতাবর্জিত পল্লীজীবনের দীনতা হীনতা কুশ্রীতা তিনি দেখেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো খড়গপাণি হয়ে ওঠেন নি। 'ছোট দুঃখ, ছোট ব্যথা' যা 'নিতান্তই সহজ সরল'–তিনি তারই শিল্পী। "পল্লীসমাজ" আর "পথের পাঁচালী"র স্রষ্টাকে পৃথক করে চিনে নিতে পাঠকের কখনো ভুল হয় না।

॥ ৩ ॥

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলি এমন শান্ত সহজ সুরে বাঁধা যে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করবার কোনো বিশেষ প্রয়োজন ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেই তাদের সার্থক শিরোনামা দেওয়া যায় : 'একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'। এবং তাঁর সাহিত্যপঠনের পরে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই যেন আমরা ফলশ্রুতি লাভ করি :

"সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে খোঁজে নিজ সীমা।"

'তৃণের শিশিরে' আলোর মহিমান্বিত প্রকাশই আমরা পাই 'কিন্নর দল' গল্পে। একেবারে বিবৃতিধর্মী গল্প. সহজ অনাড়ম্বর

ভঙ্গিতে বলা। এত সহজ লেখা যে পড়তে পড়তে অস্বস্তিবোধ হয়, আরো একটু তীক্ষ্নতা—আরো একটু তির্যক অভিব্যক্তি পাঠকের মন প্রত্যাশা করে। কিন্তু অকৃত্রিম সারল্যই এই গল্পের প্রধান বিশেষত্ব— সেটি যাকে আকৃষ্ট করবে না, গল্পের সৌন্দর্যও তাঁর কাছে ধরা দেবে না।

বিষয়বস্তু যৎসামান্য। 'গরিব, হিংসুক, কুচুটে' একটি নগণ্য গ্রামে একদা কলকাতা থেকে রূপসী, বিদুষী ও সুগায়িকা একটি বধূর আবির্ভাব হল। প্রথম প্রথম গ্রামের সকলেই তাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখল, তারপর চরিত্র-মাহাত্ম্যে নিজের গুণে আর অন্তরের ঔদার্যে সে সকলকে আপন করে নিলে। তারপরে এল তার ফুলের মতো সুন্দর সুধাকণ্ঠী ভাইবোনেরা—সেই 'কিন্নর দল' এই দুর্ভাগা গ্রামকে সুরে ছন্দে সূর্যালোকিত জীবনের সৌন্দর্যের মধ্যে জাগিয়ে তুলল। কিন্তু সৌভাগ্য বেশিদিন সইল না—কিছুকালের মধ্যেই অকালমৃত্যু এসে 'কিন্নর দল'কে কেড়ে নিয়ে গেল—ক্ষণিক আলোকোচ্ছ্বাসের পরেই আবার গ্রামের জীবনে ঘনিয়ে এল চিরান্ধকার।

ইউরোপ-আমেরিকার ছোটগল্পের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, প্রেমেন্দ্র-মানিক-তারাশঙ্করের গল্পের যাঁরা অনুরাগী—তাঁদের কাছে বিবৃতিধর্মী এই সরল গল্প স্বভাবতই বর্ণহীন মনে হবে। এমনকি শরৎচন্দ্রের হাতে পড়লেও শ্রীপতির এই রূপসী, বিদুষী, গুণবতী বধূ এত সহজেই পরিত্রাণ পেত না—অবলীলাক্রমে তাকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা—পল্লীসমাজের

পাপচক্রে পড়ে হয়তো তিনদিন পরেই তাকে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গ্রাম ত্যাগ করতে হত। কিন্তু সে সম্ভাবনার দিকেই বিভূতিভূষণ যান নি। তাঁর মানুষ জটিল নয়, সরল; তারা দুর্বুদ্ধি নয়—বরং কিছু পরিমাণে নির্বোধ। বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করেছেন, অণুতম প্রীতির স্পর্শেই এই গরিব, কুচুটে, হিংসাপরবশ মানুষগুলির শুভচেতনাকে উদ্বোধিত করা যায়। এই গল্পেও তা-ই হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব পটভূমি নির্মাণে বিভূতিভূষণ সততা রক্ষার ত্রুটি করেন নি। তাঁর বাস্তবতা সৃষ্টির উদাহরণ একটি অকালপক্ক গ্রাম্যকুমারীর বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যেই পাওয়া যাবে:

"ষোল সতেরো বছরের কুমারী - তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মার সম্বন্ধে অমান বলে বসলো—ওঃ সে কথা আর বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা।"

এ যেন একেবারে রেকর্ডিং মেশিনে তুলে আনা। কিন্তু মানুষের শুভচেতনায় বিশ্বাসী বিভূতিভূষণ এ-হেন বাক্‌পটীয়সী 'শান্তির'ও মুহূর্তে রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছেন। এই বিশ্বাস এবং উদারতা একমাত্র বিভূতিভূষণেই সম্ভব।

একটি কলহপরায়ণা সরলা গ্রামবধূর করুণ কাহিনী 'মৌরীফুল'। সে খেয়ালী, বধূ হিসাবে দুর্বিনীতা, তার ঝগড়ায় পাড়ায় কাকচিল পড়তে পায় না—সংসারের কাজেও তার

কোনো পটুতা নেই। কিন্তু ক্ষণিকের সখী শহরবাসিনী "মৌরীফুলের" সোনার কাঠি মুহূর্তে তাকে আশ্চর্য সুন্দর করে তুলেছে। বহির্মুখ স্বামী কিশোরীকে ঘরমুখো করবার চেষ্টায় তার জীবনে যে দুর্ভাগ্য-পরিণতি নেমে এল, তার মরণাচ্ছন্ন চেতনায় বিবাহ-লগ্নের যে বাঁশির সুর আর মৌরীফুলের সোনার জল দেওয়া আতর-মাখানো চিঠির স্বপ্ন সঞ্চারিত হল—তা একটি করুণ বেদনায় পাঠকের চিত্তকে আর্দ্র করে তোলে। এ-ও বিবৃতিধর্মী গল্প—একটি সংকট-মুহূর্ত আছে স্বামীর ডালের বাটিতে ওষুধ মেশাতে গিয়ে সুশীলার ধরা পড়ার মধ্যে—কিন্তু সমস্ত মিলে গোধূলির বর্ণরাগ দিনান্তিক অন্ধকারে মিলে যাওয়ার মতো এর শান্ত সহজ পরিণতি।

এই জাতীয় গল্পের সার্থকতম নিদর্শন 'পুঁইমাচা' - বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প এটি।

'পুঁইমাচা' "পথের পাঁচালী"কে মনে পড়িয়ে দেয়। সর্বজয়া এখানে অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছে—গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি দুর্গারই রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়। সরল, স্বল্পবুদ্ধি, ভোজনপ্রিয় এই মেয়েটিও দুর্গার নারকেল সংগ্রহ করবার মতো বাপের সহযোগিতায় মেটে আলু চুরি করে আনে। শেষ পর্যন্ত প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার বিয়ে, শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহ এবং পরিণামে সন্দেহজনক অকালমৃত্যু—অপরূপ সহমর্মিতা ও মমত্বের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। গল্পটির কৃতিত্ব এর রচনায়—হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি উজাড় করে দিয়ে এটি লেখা। বিভূতিভূষণ

অনুভব করেন—"Innocence"-এর মূল্য দেবার মতো মানুষ সংসারে খুব বেশি নেই—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে কখনো ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। ক্ষেন্তিকে বৈষয়িক জগৎ থেকে অকালে চলে যেতে হয়, কিন্তু তার জীবনের ছোট আশা, ছোট আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর সে রেখে যায় তারই রোপিত 'পুঁইমাচায়': "সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে···বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি···সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।"

বিপুলব্যাপ্ত পৃথিবীর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের শিরাস্নায়ুতে। ভারতের নানা প্রদেশে, বিচিত্র অরণ্যাঞ্চলে তিনি যথাসাধ্য পরিক্রমা করেছেন—শারীরিক ভাবে যেখানে যাওয়া সম্ভব হয় নি, সেখানে সাধ্যমতো মানসভ্রমণ করেছেন তিনি। তাঁর "বিচিত্র জগৎ" সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক—'চাঁদের পাহাড়ে'র অ্যাডভেঞ্চার সেই দূরযানী কল্পনারই চারণা। কিন্তু সমস্ত বহির্মুখীনতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের শেষ তীর্থক্ষেত্র তাঁরই নিশ্চিন্দিপুর—সেই জলঝাঁঝি, সেই মুচুকুন্দ ফুল, সেই বৃষ্টিভেজা বনের সোঁদাগন্ধ, ঝড়ের হাওয়ায় গাছের ডালে দোলা-লাগা দুটি বন-ধুঁদুল। তাই ঘাটশীলার অরণ্য-পাহাড়ে তাঁর দূরচারী মনের একটি মুক্তিক্ষেত্র রচনা করলেও তিনি তাঁর

বনগাঁকে ভুলতে পারেন নি ; তার মজাপুকুর, তার বনজঙ্গল তার পল্লী পরিবেশ তাঁকে নিজের কোলে টেনে এনেছে।

এই মানসিকতারই রূপায়ণ 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'। ব্যাধিতে জর্জরিতা, নাতি-নাতনীদের উপেক্ষায় উৎপীড়িতা দ্রবময়ী শেষ পর্যন্ত বনজঙ্গলভরা গ্রামের ভিটেমাটি ছেড়ে কাশীবাস করতে এলেন। বয়স সত্তর হয়েছে, সুতরাং জমি-জমা-গোরু-গাছপালার মমতা ত্যাগ করে আপাতত বারাণসীধামে পরলোকের পাথেয় সঞ্চয় করাই প্রাজ্ঞতার কাজ। কিন্তু দ্রবময়ীর অদৃষ্টে পুণ্যলাভ ঘটল না প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তিনি জগন্নাথ-বিগ্রহের পরিবর্তে অলাবু দর্শন করতে লাগলেন। প্রতিবেশিনী নীরজার অতিভক্তি এবং তাঁকে ধর্মপথে টানবার অতিরিক্ত প্রয়াস তাঁকে আরো বেশি বিরূপ করে তুলল। সরস ভঙ্গিতে বিভূতিভূষণ দ্রবময়ীর মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। কথক ঠাকুর যখন সুমিষ্ট কণ্ঠে কাশীমাহাত্ম্য ও মণিকর্ণিকার ঘাটে শিবত্বপ্রাপ্তির তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন, তখন :

"দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূর চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েছে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আমগাছে আমও নিশ্চয় খুব ধরেছিল···বারো ভূতে লুটে খাচ্ছে।" অবশেষে 'ফিরে চল্ মাটির টানে'—দ্রবময়ী নিজের গ্রামেই ফিরে এলেন। তাঁর আর শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটল না।

এই গল্প থেকে বিভূতিভূষণের জীবনবোধ ধরা পড়ে। তাঁর অধ্যাত্মচেতনা আছে, তিনি ভক্ত ও ভাবুক, কিন্তু জীবনবিমুখ নন। কুশল পাহাড়ীর সাধুর ভাষায় মানুষ অনুভব করলেই মুক্ত হয়—তার জন্যে তাকে জীবনের মায়ামমতা প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। দ্রবময়ীর কাশীবাস হয় নি - কিন্তু সহজ জীবনের পুণ্যক্ষেত্রে, স্বামীর ভিটায়, গোরু-গাছপালা-লতাপাতার প্রীতিতে, প্রতিবেশীদের স্নেহ-ভালোবাসাতেই তাঁর মোক্ষলাভ ঘটেছে। টলস্টয়ের দুই তীর্থযাত্রী বন্ধুর গল্পটি এ প্রসঙ্গে যেন আমাদের মনে আসতে চায়।

জাতি-ধর্ম-সমাজের বাইরে অম্লান ভালোবাসা, অকৃত্রিম বাৎসল্যের অসামান্য গল্প 'আহ্বান'। অপূর্ব পবিত্র এই গল্প - মাতৃস্নেহের ধারায় অভিষিক্ত। গল্পের বক্তা উত্তম পুরুষ কিছুদিনের জন্যে গ্রামে এসে এক মুসলমান করাতীর বৃদ্ধা স্ত্রীকে কৃপাপরবশ হয়ে কিছু সাহায্য করেছিলেন। সেই থেকেই এই বৃদ্ধার মনে গল্পের বক্তার জন্যে এক অপরূপ স্নেহের আবির্ভাব হল। বক্তার শিক্ষিত নাগরিক মন তার স্নেহের গ্রাম্য অভিব্যক্তিতে সব সময় প্রসন্ন হতে পারে নি ; তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে কখনো কখনো রূঢ় ব্যবহারও করতে হয়েছে বৃদ্ধার সঙ্গে।

কিন্তু বুড়ীর সেই ডাক : 'অ মোর গোপাল'—তার হৃদয়ভাঙা সেই স্নেহের নির্ঝর সমস্ত গল্পটিতে অমৃত সেচন করেছে। সেই স্নেহের অলৌকিক আকর্ষণেই যেন বুড়ীর

মৃত্যুর পরে আকস্মিকভাবে তিনি গ্রামে ফিরেছেন, তার আকাঙ্ক্ষিত 'কাফনের' কাপড় কিনে দিয়েছেন এবং শেষ মুহূর্তে তাঁর কবরে সন্তানের মতোই ঢেলে দিয়েছেন এক কোদাল মাটি। "সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল. ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।"

এই 'আহ্বান' গল্পটিই যেন বিভূতিভূষণের জীবনভাষ্যের প্রতীক—তাঁর সাহিত্যের মর্মবাণী। ধর্ম, সমাজ, শ্রেণীগত বৈষম্য সব কিছু ছাপিয়ে এই যে ভালোবাসা এই যে সমুদ্র-গভীর স্নেহ, মানুষে মানুষে এই যে আত্মীয়তার বন্ধন বিভূতিভূষণ এরই সাধনা করে গেছেন। 'আহ্বান' গল্প পড়তে পড়তে জমির করাতীর বৃদ্ধা স্ত্রীর মুখ আমাদের চোখের সামনে র‍্যাফাএল্-এর 'ম্যাডোনায়' পরিণত হয়ে যেতে চায়, আজকের শ্রেণীগত ও সাম্প্রদায়িক বিকৃত বুদ্ধি মুহূর্তে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়।

পৃথিবীর সমস্ত মহিমার উর্ধ্বভূমিতে মাতৃত্বের অবস্থান। বিভূতিভূষণের এই গল্পটি আমাদের সেই জগতেই উত্তীর্ণ করে। সেই মহিমার অরুণালোকেই এই গল্প কেবল বিভূতিভূষণের সাহিত্যেই নয় –সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও স্মরণীয়।

যে মাটির আহ্বানে দ্রবময়ী কাশীবাস ছেড়ে ফিরে এসেছিলেন—'আহ্বান' গল্পের বুড়ী যেন সেই মৃত্তিকা-জননীরই প্রতীক। বিভূতিভূষণ সেই মাটির কোলেই নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যেও পরম সার্থকতার সন্ধান পেয়েছেন।

'তুচ্ছ' গল্পে তাই কামারদের ছোট মেয়েটির মাথায় একটুখানি গন্ধতেল ঢেলে দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ—যে চরিতার্থতা, বিভূতিভূষণই একমাত্র তা লাভ করতে জানেন। অসীম কৃতার্থতার সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে : "কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।"

জগতের আনন্দযজ্ঞে এমন নিমন্ত্রণ লাভের সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

॥ ৪ ॥

মানুষ সম্পর্কে এই অপরিসীম উদারতার জন্যেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যে তথাকথিত villain নেই বললেই চলে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি 'essentially good'—তাই সামাজিক বিচারে বা নীতিধর্মের দিক থেকে তারা যা-ই হোক—বিভূতিভূষণের করুণার স্পর্শে তারা সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। 'ক্যান্‌ভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পটিকে এদিক থেকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃষ্ণলাল সৎ নয়—কোম্পানির ক্যাশ ভেঙে সে টাকা চুরি করে। তার নৈতিক জীবনও প্রশংসনীয় নয়—গোলাপীর সঙ্গে তার সুদীর্ঘকালব্যাপী যে সম্পর্ক—তার জন্য কেউ তাকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দেবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেকার কৃষ্ণলালের দুঃখ আমাদের

মর্মস্পর্শ করে—শরৎচন্দ্রের মতো সতর্কতা এবং ভাষ্যের আশ্রয় না নিয়েও তিনি অবলীলাক্রমে আমাদের মনে গোলাপীর জন্যে সমবেদনা সঞ্চার করতে পারেন। পরিশেষে বিচিত্র উপায়ে কৃষ্ণলাল যখন হারানো চাকরি পেয়ে গোলাপীর কাছে ফিরে আসে—তখন আমরা একটি পারিবারিক পরিতৃপ্তিই আস্বাদন করি। মনস্তত্ত্ববিন্যাসে এবং গল্পটির ঘটনা নির্মাণেও লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

এই ক্ষমাসুন্দর ঔদার্যের আর-একটি নিদর্শন 'বিপদ'। ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় গ্রামের বৈষ্ণবের মেয়ে হাজু শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। তার এই অধোগতিকে বিভূতিভূষণ ধিক্কার দেন নি। বরং দেখেছেন, গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে তার ক্ষুধা মিটেছে, তার জীবনের বহু অপূর্ণ বাসনা-কামনা পূর্ণতা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে রূপোপজীবিনীর বিচিত্র রূপায়ণ আমরা পেয়েছি পেয়েছি সহানুভূতি, পেয়েছি জ্বালা--পেয়েছি সমাজ-জিজ্ঞাসার "Pointed finger"। কিন্তু এমন সহজভাবে হাজুর অপরাধের এমন সত্য সমর্থন বাংলা সাহিত্যে এর আগে আমরা পেয়েছি বলে আমার মনে হয় না। বিভূতিভূষণ সংযত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সৎসাহসের যে বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না- তাঁর শান্ত নম্রতার মধ্যে যে বজ্রশক্তি সংহত ছিল, নিচের উদ্ধৃতিটি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এটিকে আমি স্মরণীয় বলে মনে করি :

"যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ভিখারিনী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে; কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাইয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।"

মানুষের প্রতি সহজ ভালোবাসাই হাজুর পদস্খলনকে এমনভাবে সমর্থন করবার শক্তি বিভূতিভূষণকে দিয়েছে। এর মধ্যে ধিক্কার নেই--অনুযোগ নেই ভাবালুতার অবকাশ মাত্রও নেই: কোনো সমাজ সচেতনার বিশিষ্ট উদ্দেশ্যও এর অন্তরালে নিহিত নয়। স্বাভাবিক সূর্যালোকের মতোই এই সত্যবুদ্ধি বিভূতিভূষণের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পের পরিণতিতে তাই কলঙ্কিনী হাজু আমাদের মমতারই অভিসেচন লাভ করে—প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগরের' মেয়েটির মতো অপরিসীম শূন্যতায় হারিয়ে যায় না।

একদিকে দ্রবময়ীর মাটি-মায়ের আকর্ষণ, অন্যদিকে সুদূরের পিপাসা—বিভূতিভূষণের মধ্যে এই দুটির দ্বন্দ্ব সর্বদা অনুভব করা যায়। এ যেন সেই ঘর-পালানো কিশোরের মানস-

সংশয়—মহাপৃথিবীর আকর্ষণে 'পথের দেবতার' অঙ্গুলি-সংকেতে যে দেশ-দেশান্তরের অভিমুখী, অথচ সন্ধ্যালগ্নে নিজের ছোট ঘরটিতে মায়ের কোলের ডাক যাকে ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করে দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যেও সুদূরের অভীপ্সা—কিন্তু যে রোম্যান্টিক্ যন্ত্রণায় এলিজাবেথীয় কবিদের মতো তিনি বহির্বিশ্বের মহাপ্রাঙ্গণে মুক্তিলাভ করতে চান—বিভূতিভূষণের আকুলতা সে জাতের নয়। কিশোরের মুগ্ধ চোখ নিয়ে তিনি দেখতে চান—আস্বাদন করতে চান—রূপকথার স্বপ্নরাজ্য অতিক্রম করে রূপেশ্বরের আনন্দরাজ্যে পোঁছোতে চান।

কিন্তু 'মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই— সে-কথা যে যাই পাসরি'! তারই সরস এবং মৃদু বেদনাস্বাদী গল্প 'একটি ভ্রমণ-কাহিনী'। গোপীকৃষ্ণবাবু এবং শম্ভু ডাক্তার দুজনেই 'সুদূরের পিয়াসী'—দূর-দূরান্ত এবং দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের জন্যে তাঁদের প্রোগ্রাম ও টাইম টেব্‌ল সর্বদাই প্রস্তুত। পেশোয়ার থেকে বীরভূমের নলহাটি পর্যন্ত কোনো জায়গাই পরিকল্পনার বাইরে পড়ে না—কিন্তু যথাসময়ে বাধা দেয় অর্থাভাব এবং পারিবারিক বিড়ম্বনা। শেষ পর্যন্ত দুজনের ভ্রমণের স্বপ্ন সার্থক হল বারাসত থেকে দু-মাইল দূরে লাঙলপোতায় গিয়ে।

গল্পটির মধ্যে মৃদু ব্যঙ্গ এবং ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস থাকলেও বস্তুত কোনো অতৃপ্তি নেই। "দুয়ার হইতে অদূরে"ও মানুষের জন্যে বহু-বিচিত্র অপেক্ষা করে আছে—দেখবার চোখ থাকলে এক মুঠো বসন্তের ঘাসের ভেতরেও নন্দন বনের পুষ্পশোভা নিরীক্ষণ

করা চলে। বিভূতিভূষণ এ গল্পে তা-ই করেছেন। হিমালয়ের তুষারদীপ্ত গ্লেশিয়ারে, বর্মার সেগুন বনে, তরাইয়ের অরণ্যে অরণ্যে পরিক্রমা করতে পারলে তিনি খুশিই হন; কিন্তু অভাবে গ্রামের খেতে ধানের শীষে শিশিরবিন্দুর ওপর সূর্যকিরণের ইন্দ্রধনুরাগ দেখেও তাঁর ক্ষোভ নেই— তিনি স্বল্পেই সন্তুষ্ট। এই জন্যেই 'সিঁদুরচরণ' গল্পের সিঁদুরচরণ যখন কেষ্টনগরের আরো দু স্টেশন পরে বাহাদুরপুর পর্যন্ত বেড়িয়ে এল, তখন গ্রামের লোকের যে মুগ্ধ শ্রদ্ধা তার প্রতি উৎসারিত হয়েছে—লেখক সে জন্যে তাকে বিদ্রূপ করতে পারেন নি।

'কনে দেখা' গল্পটি যেন প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণেরই আত্মকথা। নিসর্গের প্রতি যে অপরূপ মমতা তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র উৎসারিত হয়েছে– "আরণ্যক" উপন্যাসে যে আধপাগলা যুগলকিশোর সরস্বতী কুণ্ডার ধারে উদ্যান-উপবন রচনা করে— গল্পটিতে সেই মমতারই প্রকাশ, 'এরিকা পামে'র প্রতি হিমাংশুর অন্ধ দুর্বার স্নেহ যুগলকিশোরেরই অনুবর্তন। 'এরিকা পামে'র উপযুক্ত সহধর্মিণীর জন্যে বৈঠকখানা বাজারে হিমাংশুর কনে দেখতে আসার মধ্যে লৌকিক বিচারে পাগলামি থাকতে পারে— কিন্তু বিভূতিভূষণ হিমাংশুর অন্তরটিকে সহমর্মিতার দ্বারা নির্ভুলভাবে চিনে নিয়েছেন।

বিচিত্র রসের গল্প হিসেবে 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' বিভূতিভূষণের অন্যতম সার্থক রচনা। নিজের জন্যে পল্লীগ্রামে একটি কোঠাবাড়ি তোলবার উদ্দেশ্যে ভণ্ডুলমামার অনন্তব্যাপী প্রয়াসের

যে কাহিনী এবং বাড়ি মোটামুটি গড়ে উঠবার পরে অজ-পাড়াগাঁয়ের ঘন জঙ্গলে তাকে আঁকড়ে থাকবার যে মর্মস্পর্শী কারুণ্য--তার নিজস্ব শিল্পসৌন্দর্য ছাড়াও গল্পটির আর-একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এই বাড়িটি গড়ে ওঠা-না-ওঠার সঙ্গে গল্পের বক্তা অবিনাশ বাবুর যে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে, গল্পটির আসল রস সেইখানে। শুধু মনস্তত্ত্বই নয়—এর মধ্যে একটা দার্শনিক বিরাটত্বও নিহিত আছে। কেবল ভণ্ডুল মামাই নন—আমরা প্রত্যেকেই যেন এমনি করে ইটের পর ইট সাজিয়ে চলেছি—অথচ আমাদের বহুবাঞ্ছিত গৃহটি কোনোদিনই আমরা গড়ে তুলতে পারব না। অথবা কেবল আমরাই নই—এ যেন বিশ্বসৃষ্টির চিরন্তন ইতিহাস—যুগ-যুগান্তর ধরে মহাপৃথিবীর চির অসমাপ্ত সর্জনলীলা :

"যেন অনাদিকাল, অনাদি যুগ ধরে ভণ্ডুল মামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠচে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে···ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।"

এই Sublimation—বিন্দুতে এই সিন্ধুসংকেত 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি' এইখানেই মহিমোত্তীর্ণ।

রোম্যান্টিক্ কল্পনার বিস্তারে 'মেঘমল্লার' একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

গল্পটির বিষয়বস্তু কাব্যনাট্যের উপযোগী—রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়লে এই গল্পই "বাল্মীকি প্রতিভা" বা "চিত্রাঙ্গদা" হয়ে উঠত। ভাষার সৌন্দর্য, বর্ণনার নিপুণতা এবং কল্পনার কুশলতায় 'মেঘমল্লার' বাংলা সাহিত্যে তার যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

॥ ৫ ।

অধ্যাত্মবাদী বিভূতিভূষণ অতীন্দ্রিয়তায় বিশ্বাসী। তাঁর "দৃষ্টি-প্রদীপে" সে-কথা আছে "দেবযানে" তিনি জীবনাতিশায়ী জ্যোতির্লোকের বার্তা শুনিয়েছেন। এই অতীন্দ্রিয়তায় অনুরাগবশত তাঁর কতগুলি লৌকিক সংস্কার-নির্ভর গল্প আছে- যেমন 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'নুটি মন্তর', 'ভৈবব চক্কোত্তির গল্প' ইত্যাদি। এদের মধ্যে ব্ল্যাক ম্যাজিকের কথা আছে, তন্ত্রেব শক্তি প্রকাশিত হয়েছে, ভূত-প্রেতের অস্তিত্বেব স্বীকৃতি আছে। যাবা বিশ্বাসপ্রবণ তাঁরা গল্প-গুলিকে একভাবে দেখবেন, কিন্তু বিচিত্র রসেব দিক থেকে যাঁরা এদের আস্বাদন কববেন তাঁরাও বঞ্চিত হবেন না। এড্গার অ্যালান পো কিংবা ডব্লু-আর জেম্সের অতিলৌকিক গল্পগুলি যদি সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে, তা হলে এদের কোনো কোনো গল্পও সে-সম্মান পাবে অন্তত 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' সম্বন্ধে সম্ভবত সে-কথা বলা যায়। পরিবেশ

রচনায় এবং বর্ণনার যাথার্থ্যে তারানাথ তান্ত্রিকের একাধিক গল্প আমাদের মনে অতিলৌকিক-প্রত্যয় সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

জীবন, পৃথিবী আর মানুষ সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের শেষ কথা কী? 'নাস্তিক' গল্পে বিশ্রুত পণ্ডিত জৈন সন্ন্যাসী লোকনাথের মাধ্যমেই সে-কথা তিনি বলে গেছেন। সর্ববিদ্যায় বিশারদ, সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম লোকনাথ শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বরহস্যের কোনো সমাধান—জাগতিক ও মহাজাগতিক কোনো প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে অসীম নৈরাশ্যে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি: "সবদিকেই অন্ধকার, কোনো দিক থেকে কোনো আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।"

কিন্তু এই হতাশার মধ্যেও "দূরের নীল-শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্তপলাশের বন" কী যেন এক তাৎপর্য বহন করে আনত চকিতে মনে পড়ত জৈনধর্মবিহারে বিদ্যালাভ করতে আসবার পূর্বে তাঁর যৌবনের স্বপ্ন-মায়ার কথা – যার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি আর ফিরতে পারেন নি। কিন্তু জোর করে লোকনাথ নিজেকে সেই স্মৃতি-বিহ্বলতা থেকে ফিরিয়ে আনতেন। তিনি দার্শনিকাচার্য লোকনাথ—সমগ্র লৌকিক বাসনা-বেদনার ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান-- একমাত্র বিশ্বরহস্যের মূলানুসন্ধান ছাড়া তাঁর ধ্যেয় নেই, জ্ঞেয় নেই।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই হচ্ছে 'ক্ষ্যাপা'--যে কাল-সমুদ্রের তীরে জ্ঞানের 'পরশ পাথর' মিথ্যাই খুঁজে বেড়াল—অথচ সংসার

ও পৃথিবী তার প্রেম-প্রীতি-করুণার যে 'পরশ পাথর' তার হাতে তুলে দিয়েছিল—অন্ধ মূঢ়তায় তাকে সে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। লোকনাথের কাহিনীতেও এই ট্র্যাজেডীই অভিব্যক্ত। তাই মৃত্যু-মুহূর্তে তাঁর আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে চির-নিরুত্তরের অন্ধকারপটে ভেসে উঠল: "পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে ?···কেন আমায় মারবে ? ··এ পাড়ায় আসি বলে ?··· আর কক্‌খনো আসব না····দেখে নিও, আর ককখনো যদি আসি···

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ, আবদ্ধ রইল ”

এই মেয়েটি সংসার এ কান্না প্রেমের—এ অভিমান বাঞ্ছিতার। প্রকৃতিপ্রবণতা হোক আর জ্যোতিলোকচারণাই হোক --এই হল বিভূতিভূষণের শেষ কথা। এই মর্ত্য মৃত্তিকার তপস্যা যিনি করেন, রবীন্দ্রনাথের স্বর্গভ্রষ্ট আত্মাটির মতো যিনি জননী-পৃথিবীর স্তন-সুধায় কৃতকৃতার্থ—তাঁর সাধননিষ্ঠ সত্তা এক মহাসত্যের ছায়ায় আশ্রিত হয়েছে। আর সেই সত্যের জোরেই বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন॥